জসীম উদ্‌দীন : গ্রাম-বাংলার সাংস্কৃতিক চৈতন্য

জসীম উদ্‌দীন : গ্রাম-বাংলার সাংস্কৃতিক চৈতন্য

মাহমুদ শাহ কোরেশী

কবি জসীম উদ্‌দীন :
গ্রাম-বাংলার সাংস্কৃতিক চৈতন্য

[IMMORTALITY OF PASTORAL PATTERNS :
POET JASIM UDDIN'S CREATIVE WORLD]

মাহমুদ শাহ কোরেশী

গণপ্রকাশনী
শহীদ রফিক-জব্বার মহাসড়ক, ঢাকা-১৩৪৪

প্রকাশনায়
গণপ্রকাশনী
শহীদ রফিক-জব্বার মহাসড়ক
নয়ারহাট, ঢাকা-১৩৪৪

□

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪২১

□

মুদ্রণে
গণমুদ্রণ লিমিটেড
শহীদ রফিক-জব্বার মহাসড়ক
নয়ারহাট, ঢাকা-১৩৪৪

□

প্রচ্ছদ
সুব্রত

□

মূল্য
১৫০.০০ টাকা

□

**IMMORTALITY OF PASTORAL PATTERNS :
POET JASIM UDDIN'S CREATIVE WORLD**
by
Mahmud Shah Qureshi

□

Published by
Gonoprakashani
A Project of Gonoshasthaya Kendra Trust
Shahid Rafique-Jabbar Mahasarak
Nayarhat, Dhaka-1344
Bangladesh

□

First Edition
April 2014

□

Printed at
Gonomudran Limited
Shahid Rafique-Jabbar Mahasarak
Nayarhat, Dhaka-1344
Bangladesh

□

Price
Taka 150.00

ISBN : 978-984-90124-8-1

উৎসর্গ

গ্রন্থপ্রেমী ও গ্রন্থকার-সুহৃদ
ফজলে রাব্বি – আমাদের প্রিয় রফিক ভাই

মাহমুদ শাহ কোরেশী

কৈফিয়ত

বাংলায় একটা প্রবচন আছে : 'বার হাত কাঁকুরের তের হাত বিচি'। আমার বর্তমান প্রয়াস কি তাই হতে যাচ্ছে? জসীম উদ্‌দীন সম্পর্কে ইংরেজিতে একটি ছোট্ট বই লিখবো, এ ছিলো অন্যতম অভিপ্রায়। ১৯৬৩/৬৪ সালে তাঁর ওপর ফরাশিতে কিছু লিখেছি – যদিও হাতে উপযুক্ত উপকরণ ছিলো না। ১৯৮৪ সালের বসন্তে কানাডায় এক কনফারেন্সে যাবার সুবাদে ইংরেজিতে তড়িঘড়ি একটা প্রবন্ধ লিখে বসি। বেশ কিছুটা প্রশংসিত হলেও আমার মনে হয়েছে, সেটা বড় করবার সুযোগ খুব-একটা নেই।

বাংলা একাডেমিতে *জসীম উদ্‌দীন জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ* প্রকাশনার জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হলে নতুন কিছু কথা ভেবে রাখলাম। কিন্তু তাও খুব স্বল্প কথায়। অথচ কত ঢাউস লেখা বেরিয়েছে তাঁর ওপর! অতএব, আমার কাছে আর একটা উপায় রইলো, তাও বাংলা প্রবাদে সুপরিচিত : 'মাছের তেলে মাছ ভাজা'। আমি 'পরিশিষ্ট' দিলাম কবির অতি-পরিচিত এবং প্রায়-অপরিচিত কিছু রচনা-সংগ্রহ দিয়ে।

লালন শাহ'র ওপর রচনাটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আমার প্রথম পিএইচ.ডি ছাত্র অকাল-প্রয়াত অধ্যাপক সোলায়মান আলী সরকার। তাঁর সহায়তায় বরেন্দ্র গবেষণা যাদুঘর থেকে এটা কপি করে এনে আই.বি.এস জার্নালে ছাপিয়েছি। আশ্চর্য, ৮৮ বৎসর পার হয়ে গেল, এটা মনে হয় দেশ-বিদেশের অগুনতি লালন গবেষকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। অথচ এটি অসামান্য মূল্যবান গবেষণা প্রবন্ধ। সম্প্রতি অবহিত হলাম : জসীম উদ্‌দীন-এর *বাউল গ্রন্থ* প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর ২৩ বছর পর, ২টি প্রবন্ধ নিয়ে। একটি 'বাউল', অন্যটি 'তত্ত্বসাহিত্যে কবি লালন'। (দ্রষ্টব্য : তিতাশ চৌধুরী, 'জসীম উদ্দীনের বাউল গ্রন্থ – সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য'; নয়া দিগন্ত, ১৪ পৌষ ১৪১৯, ২৮ ডিসেম্বর ২০১২)।

১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে জসীম উদ্‌দীন-এর বক্তৃতাও ছিল একটা যুগান্তকারী ঘটনা। সে অনুষ্ঠানে কাজী নজরুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সে সভায় আমিও ছিলাম একজন শ্রোতা। এ ছাড়াও কবিকে দু'একবার দূর থেকে দেখেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কখনো আলাপ হয়নি। তবু বহুজনের মতো আমি তাঁর অনন্য প্রতিভার প্রতি সতত শ্রদ্ধাবনত।

২রা বৈশাখ, ১৪২১

মাহমুদ শাহ কোরেশী
গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

সূচীপত্র

কৈফিয়ত	৫
কবি জসীম উদ্‌দীন : গ্রাম-বাংলার সাংস্কৃতিক চৈতন্য	৭
Immortality of Pastoral Patterns : Poet Jasim Uddin's Creative World	৯
গদ্য রচনা	
লালন ফকীর	২১
নজরুল	৩৪
অভিভাষণ	৩৮
কবিতা	
রাখাল ছেলে	৫১
কবর	৫২
পল্লী জননী	৫৭
নিমন্ত্রণ	৫৯
আমার বাড়ী	৬০
মামার বাড়ী	৬১
এ লেডি উইথ এ ল্যাম্প	৬২
নিবেদন	৬৩
মুক্তিযোদ্ধা	৬৫
ধামরাই রথ	৬৬
কাব্যগাথা	
নক্সী কাঁথার মাঠ	৬৮
সোজন বাদিয়ার ঘাট	৮০

কবি জসীম উদ্‌দীন :
গ্রাম-বাংলার সাংস্কৃতিক চৈতন্য

বিংশ শতাব্দীর এক অনন্য সাহিত্য-সাধক জসীম উদ্‌দীন। 'পল্লীকবি' অভিধায় তিনি সুপরিচিত ছিলেন তাঁর জীবৎকালেই। পল্লীবাসী বা পল্লীকবি তিনি অবশ্যই ছিলেন কিন্তু আসলে অন্তর্গতভাবে আধুনিক ভাবধারায় দীক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত, একজন রোমান্টিক কবি, বাস্তববাদী বুদ্ধিজীবী – সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক চৈতন্য সংলগ্ন এক মানুষ – এই হবে তাঁর সেরা পরিচয়। তিনি হলেন প্রথম দিকের একজন বাঙালি মুসলমান কবি যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছেন, এমনকি যথাসময় এম.এ ডিগ্রী লাভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করেছেন। অথচ সে সময়ে তাঁর সমাজ থেকে খুব বেশি লোক বিদ্যালয়ের চৌকাঠ পর্যন্ত পার হতে পারতেন না। ছাত্র থাকাকালীন সময়েই তাঁর গুণগ্রাহী তথা সত্যিকার Mentor দীনেশ চন্দ্র সেন মহোদয়ের বিশেষ বিবেচনায় তাঁর কবিতা স্কুলপাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এবং অনেকেই জানেন সেই সুখ্যাতি তিনি অর্জন করেন তাঁর 'কবর' কবিতার মাধ্যমে। 'কবর'-এর অন্যান্য গুণাবলীর কথা বাদ দিলেও এটি বাংলার সাহিত্য-ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ জনপ্রিয় রচনা।

জসীম উদ্‌দীন তাঁর কাব্য সাধনার প্রথম যুগে পল্লী গীতি ও গাথা সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। এবং একই সঙ্গে বহু সমধর্মী গীতি গাথাও তিনি রচনা করেন যা মৌলিকত্বে, মানবিক আবেদনে অনবদ্য। এগুলো স্বদেশে যেমন প্রশংসিত, বিদেশে আরো বেশি সমাদৃত হয়েছে। আমি বিশেষভাবে 'নকশী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' – এ দুটি কাব্যের কথা এখানে উল্লেখ করবো। লন্ডন, প্যারিস, প্রাগ, মস্কো, ন্যুইয়র্ক তথা বিশ্বব্যাপী বুদ্ধিজীবীদের তীর্থক্ষেত্রে এগুলো আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির মৌল নিদর্শনরূপে গৃহীত। অবশ্য জসীম উদ্‌দীন-এর আরো বহু কবিতা উপযুক্ত সমজদারের ও অনুবাদকের দ্বারা আলোচিত বা অনূদিত হবার অপেক্ষায় রয়েছে। 'য়ুরোপ' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৫৪) জাক্ স্তেপোস্কির ফরাশি অনুবাদ তাঁর কয়েকটি কবিতাকে সে দেশেও জনপ্রিয় করে তুলেছে। চেক পন্ডিত দুশন্ য্ভাবিতেল তাঁর (ইংরেজি) 'বাংলা

সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে জসীম উদ্‌দীন-এর কবিতাকে 'জনপ্রিয়তায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী' ঘোষণা করেছেন।

ঔপনিবেশিকতার কারণে, গ্রাম ও শহরের উন্নয়ন ভিন্নতার জন্য আমাদের সংস্কৃতির বিভেদ-রেখা একটু বড় হয়ে দেখা যায়। পল্লী অনুরাগী কবিকূল – কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বন্দে আলী মিয়া, কাজী কাদের নওয়াজ, গোবিন্দ লাল দাস, ওহীদুল আলম প্রমুখ তাঁদের গ্রামীণ অভিজ্ঞতা আমাদের কাব্য সাহিত্যে উজার করে দিয়েছেন। কিন্তু অনেকটা আধুনিকতার মোহে আমরা সব যথোপযুক্তভাবে গ্রহণ করিনি। সেদিক থেকে জসীম উদ্‌দীন সৌভাগ্যবান। পল্লীকবির রচনা কিংবা পল্লী বিষয়ক démodé বা রুচি বহির্ভূত সেন্টিমেন্টাল জিনিসের প্রবক্তারূপে তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার সফল হয়নি। কেননা জসীম উদ্‌দীন আসলে একজন অসাধারণ ব্যতিক্রমধর্মী আধুনিক কবি যিনি গাঁও-গেরামকে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি বাংলাদেশের মানুষের শাশ্বত অনুভূতিতে তার অনুরণন ছড়িয়ে দিয়েছেন। এক ধরনের সাংস্কৃতিক Synthesis তথা সমন্বয়ের পথ অনুসন্ধান করেছেন আজীবন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাহিনীর গাঁথুনী, ভাষায় অলংকার ও চিত্রকল্পের প্রয়োগ সার্থক। অতি সরল একটি উদাহরণ এখানে উপস্থাপন করা যেতে পারে :

মাঠের রাখাল, বেদনা তাহার আমরা কি অত বুঝি?
মিছেই মোদের সুখ-দুখ দিয়ে তার সুখ-দুখ খুঁজি।
আমাদের ব্যথা কেতাবেতে লেখা, পড়িলেই বোঝা যায়;
যে লেখে বেদনা বে-বুঝা বাঁশীতে কেমনে দেখাব তায়?
অনন্তকাল যাদের বেদনা রহিয়াছে শুধু বুকে,
এ দেশের কবি রাখে নাই যাহা মুখের ভাষায় টুকে;
সে ব্যথাকে আমি কেমনে জানাব? তবুও মাটিতে কান
পেতে রহি যদি কভু শোনা যায় কি কহে মাটির প্রাণ!

(*নক্সী কাঁথার মাঠ*, ২৬)

কবি হলেও জসীম উদ্‌দীন একই সাথে একজন অসামান্য গদ্যশিল্পী। অতি সুখপাঠ্য, রসাল ও প্রাঞ্জল তাঁর গদ্য। উদাহরণ : তাঁর রচিত 'বোবা কাহিনী', 'জীবন কথা', 'ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়', 'চলে মুসাফির' (আমেরিকা ভ্রমণ), 'যে দেশে মানুষ বড়' (রাশিয়া ভ্রমণ) প্রভৃতি। তাঁর নাট্য রচনা 'বেদের মেয়ে', 'মধুমালা', 'পদ্মাপার' প্রভৃতি যেমন স্ব স্ব ক্ষেত্রে উজ্জ্বল সাহিত্যকর্মের দৃষ্টান্ত বহন করছে তেমনি মঞ্চসফল নাট্যকর্মরূপেও সুদীর্ঘ ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে।

IMMORTALITY OF PASTORAL PATTERNS: POET JASIM UDDIN'S CREATIVE WORLD

JE VOUDRAIS PEINDRE DE FAÇON SI SIMPLES
QU' À LA RIGUEUR TOUT LE MONDE QUI À DES
YEUX PUISSE Y VOIR CLAIR

Van Gogh[1]

Has he been only a village poet, a *Pallikavi* and left merely pastorals for posterity? Answering the question might be found useful not only to assess a celebrated poet but also to study the reasons for a certain gap in the development of modern Bengali literature of the mid-twentieth century. Indeed Jasim Uddin (1903-1976)[1A] was one of the few most distinguished literary figures marked by his distinct lyrical personality. In the Bengali poets' pantheon, he would certainly be placed after Rabindranath Tagore (1861-1941) and Kazi Nazrul Islam (1899-1976). Like his simple name without a family title such as is so common to his countrymen[1B], Jasim Uddin's poetry is simple, unpretentious and devoid of unnecessary conventions or imageries. For nearly five decades he wrote pastoral poems, narrative *kāvyas,* songs and dramas on folk themes. But these creations are fresh innovations or recreations of a modern mind and not just the blind imitations of the timeless folk style. Hence, Jasim Uddin instilled in the minds of modern Bengali intelligentsia a sense of value which emanates from the village, thus allowing everyone to feel the importance of the tradition and the heritage of rural civilization. And unlike his peers, he could retain a relationship with the illiterate and half-literate masses, no mean achievement in itself.

With the publication of his early poem, "Kabar" ("The Graves"), he instantly became famous and known to the furthermost corner of Bengal during the early thirties. This was

particularly due to the acceptance of this poem in the school final text book of the University of Calcutta, besides the fact that it was published in a renowned journal of the avant-garde writers, *kallol.* A close examination, however, reveals that at the time and even later, his success in literary quarters was rather limited. Dinesh Chandra Sen, Rabindranath Tagore, Abanindranath Tagore, Kazi Nazrul Islam--all had encouraged him but they had some doubt about the success of the genre which Jasim was introducing. Gradually, however, he was able to create a world of his own during the thirties while a *sturm and drang* continued in Bengali literary history with the later writings of Tagore on the one hand and of the so-called anti-Tagore modernists on the other. In 1939, Jasim's *Naksi Ḱāthār Māth* was translated into English and was received very well. This brought special kudos to his poetic career.

II

The geographical entity now known as Bangladesh is, to some extent, a cluster of villages. It was more so during the first half of this century when Jasim Uddin lived there and enjoyed so much his living that he collected folk songs and composed poems and songs to immortalize the eternal flow of life in Bengal. E. M. Milford, his translator, justly observes:

> The villages of East Bengal have had a vigour and vitality of their own. Folk art and craft and dance have flourished there. Both Jasim Uddin, the poet, and Jamini Roy, the artist, have found inspiration from them. The rivers and canals of East Bengal have reared a manly people accustomed to swimming and boating and fishing. On the other hand, there is an emotional strain in Bengalis which the sufferings of extreme poverty and a tragic history have developed in them. They are tender and imaginative; given to tears and laughter, their stories end with tears unlimited.

But with World War II already at hand the village folk no longer found before them the idyllic "Golden Bengal." Nor did the city dwellers, having left parents and sometimes wives in the villages and feeling themselves uprooted. All suffered from an incurable nostalgia. All could receive a kind of solace in the pastorals or village ballads of Jasim Uddin. The forces and the weaknesses, the hopes and the despairs of the people of the delta had not been really written before, particularly not in the way Jasim Uddin did. Another English Lady, Miss A. G. Stock, who came to teach at the University of Dhaka just after the British had left, had some interesting comments in her *Memoirs.* She writes about Jasim Uddin:

> He is that rare phenomenon, a good poet whose University education has not cut him off from the country tradition; illiterate villagers would accept his songs and ballads in the same spirit as those they learnt from their grand parents. I should think his standing among them was analogous to Douglas Hyde's among the native Irish speakers at the turn of the century . . .[2]

Interestingly enough, she narrated Jasim Uddin's country, the East Pakistan of the time (and Bengal of eternity) as "a natural landscape of greenness and wide waters, a human landscape compounded of poetry, politics and poverty."[2]

Now Faridpur, the native district of Jasim Uddin, is perhaps especially compounded with poetry, politics and poverty. The place has produced a good number of illustrious sons of Bengal. Among these we may note Alaol, an outstanding poet in the middle ages, Nawab Abdul Latif, promoter of Muslim modernism in the nineteenth century Bengal, to Shaikh Mujibur Rahman, Father of the Nation of Bangladesh, and the two giant littérateurs Kazi Abdul Wadud and Humayun Kabir. Besides, Faridpur had perhaps more zamindars and other powerful people than did other districts in modern times. But there was at the time of Jasim Uddin, and there is yet, poverty--indescribable human misery

mainly due to natural calamities, particularly because of the change of the course of rivers which destroy human habitats and rice and jute fields. Most of these uprooted people today swarm in Dhaka. Ask the rickshaw pullers or maid servants in the houses of the Bangladesh capital and you will learn that they often have come from Faridpur.

Jasim Uddin himself came from a poor family; once solvent, the family developed taste in cultural pursuits. His father was a teacher. Jasim, for his days, appears to have been a rare example of someone able to complete university education while busying himself all the time in literary activities. This education did not, however, alienate him from his people. The more he advanced in age and experience, the more he remained attached to the people. This attachment, a life-long affair, moulded his whole intellectual existence. In this matter he behaved very differently from his fellow writers and intellectuals, who found themselves developing split personalities. Barbara Painter rightly points out:

> Jasim Uddin knows every facet of village life in Bengal and is partial to rural people. The heroes of his poems and stories are farmers, fishermen, ferrymen, boatmen, weavers, cowherds, even roadside barbers, wandering gipsies, palmists - and astrologers. For years he has listened to folksong and folktales and in his own poetry has tried to capture the rural manner of speech and thought.[3]

III

Jasim Uddin's creative world is quite impressive. Equally impressive are the reviews and critical studies on him.[4] A cautious reviewer, however, might feel that only a small number of his pastoral poems would reach any height of artistic excellence even though his early poems, such as "Kabar" ("The Graves"), "Palli-Janani" ("The Village Mother"), "Pratidan" ("Reciprocity") and the narrative *kavyas* like *Naksi Kāthār Māth*

(The Field of the Embroidered Quilt) and *Sojan Bādiyār Ghāt (Gipsy Wharf)* are considered as immortal pieces and loved by all. But there are many more remarkable poems on a wide variety of subjects and moods, and they are generally centered around the rural scene. He composed hundreds of songs initiating a new genre of *palli-sangit* (village song), and several dramas which are full of songs and dance tableaux and hence contribute not only to the area of literature but also to that of the performing arts of modern Bengal. In this category, *Beder Meye* attracts attention for its widespread popularity.

Prose writings of great poets are apt to be ignored. This is the case with Jasim Uddin. Yet there are a few critics, including the present writer, who would like to consider his prose as of special value not only for its readability but also for its extraordinary artistic qualities.[5] In fact, what Roman Jakobson writes on the prose of Pasternak can also be said about the prose of Jasim Uddin:

> Que sa démarche soit d'une touchante maladresse ou qu'elle atteste une habileté consommée, on sent qu' elle ne lui est pas naturelle; elle ressemble trop aux pas d'un danseur, l'effort y est apparent.[6]

Like his great mentor, D. C. Sen, the literary and cultural historian, Jasim created a prose which may be named "rhapsodic prose." The creations in this form are ideal for describing his nostalgia, his passion for the folk sense of drama and the subtle but simple feeling of the age-old experiences of life. Even the unusual, formal *(sadhu)* style of his prose keeps us completely absorbed in reading him.

Although timeless in its orientation, Jasim Uddin's poetry originates, no doubt, from the very core of the common people and it represents the general mood of the rural folk. Living in the village in his early youth, Jasim felt the futility of the nineteenth century pseudo-classic tradition of Michael Madhusudhan Dutt or

the Romantic lyricism of Rabindranath Tagore, created and consumed essentially by the city people. As a young man, he also observed the political movements directed against the foreign rulers. These movements had so far been conducted from the city. But Gandhi's noncooperation movement gave incentive to a "back to the village" approach. At the time Jasim's Faridpur was quite active with the revolutionaries of *Anusilan* group and the Congress supporters. For some time the poet himself remained an activist in the non-cooperation movement.[7] Hence, under the socio-political order of the day, Jasim's all-out effort was to recreate, with the available materials, an ideal and eternal pastoralism which would immortalize him and his idea. He felt, as if with a mission, that, even at the risk of going against the current, he must explore the different states of consciousness, the dreams or reveries of his people. And this he had to achieve without ignoring the complex pattern and troubled coexistence of the two equally important communities, the Hindus and the Muslims.

But Jasim did not view the problem from a communal angle. His ultimate intention was to reveal the beauties in a suffering humanity, so he lovingly depicted the real internal situation of the life around him. Thus, he explains the background of his great ballad, *Sojan Bādiyār Ghāt (Gipsy Wharf)*:

> In our Faridpur district there live many poor farmers, Muslim and Namasudra (Hindus). Almost continuously there is a quarrel among them over some insignificant incident. In all these quarrels the wealthy Hindus and Moslems encourage them and drive them down the path of disaster. Among the rich and the landlords there is no distinction of caste. In the world of the exploiters all are of one class. If one could see the condition these unfortunate Namasudras and Moslems are left in by the oppression of these

> people, one could not hold back tears from one's eyes. With just such incidents the plot of this Book is constructed.[8]

From the beginning of his poet's career, Jasim could display this quality of impartiality. While reviewing his very first book of verses, *Rākhāli* (pastoral poems), Kalidas Ray, a poet of similar tendency and a critic of some distinction, compared him with Kumud Ranjan Mallick, a well-known poet of West Bengal. But Mallick in Ray's opinion "had seen the natural surroundings of the village *(palli-prakrti)* as if with the eyes of a Hindu poet." But, he continued, "Jasim has observed with the eyes of a Bengali, that is to say, he has observed with the eyes of both Hindu and Muslim. Here is also the novelty of his poems." This is indeed a great achievement for Jasim Uddin, and he could attain this by following the tradition of the folk poets and singers which existed then and still exists. To a large degree his contemporaries had been victims of circumstances in this regard, losing that quality of impartiality.

In pastoral poems and ballads Jasim Uddin expressed his *Weltanschauung* more intensely than in other forms of his literary creations. Consider, for example, the following lines of the *Field of the Embroidered Quilt:*

> What may we know of the secret sorrow
> Of the shepherd in the field?
> In vain we search in our joy and our pain
> The secret of his to yield.
> Our griefs are written in verse and book
> That those who read may know.
> But dumb are the griefs of the shepherd boy
> Which only the flute can show.
> Eternal the pain that is written only
> On the tablets of the heart,
> Unsung by the poets of our land
> Who ignore the shepherd's dart.
> Yet I may try to fathom this pain,

To the earth if I press my ear
The voice of the soil speaks to me,
Its heart-beats I can hear.
The poets write of Brindaban
And tell of the play god;
The joys and pains of kings and emperors,
But not of the men of the sod.
Exiled in the heart of the village
Their speech but half understood
How shall we know these brothers and sisters,
How shall we feel their mood?
How shall we say what waves of pain,
In the heart of an exile beat?
How can words express the grief
Of the bird that does not weep?
Only he knows that the hunter's arrow
Has pierced his breast.[9]

We do not know if there can be any better introduction or justification for the pastoral patterns than this at a time when such attempts could easily be failures or at least considered as *démodé*. It is strange to find that Bengali pastoralism has parallels in English literature. For not only in the nineteenth century did pastoral poetry flourish in England, but, as George Orwell writes in one of his 1940 essays:

> War poems apart, English verse of the 1910-25 period is mostly "country". The reason no doubt was that the *rentier*-professional class was ceasing once and for all to have any real relationship with the soil; but at any rate there prevailed then, far more than now, a kind of snobism of belonging to the country and despising the town. England at that time was hardly more an agricultural country than it is now ...; Most middle-class boys grew up within sight of a farm, and naturally it was the picturesque side of farm life that appealed to

> them--the ploughing, harvesting, stack-thrashing and so forth. Unless he has to do it himself a boy is not likely to notice the horrible drudgery of hoeing turnips, milking cows with chapped teats at four o'clock in the morning, etc., etc. . . . Most boys had in their minds a vision of an idealised ploughman, gipsy, poacher, or gamekeeper, always pictured as a wild, free, roving blade, living a life of rabbit snaring, cockfighting, horses, bear, and women.[10]

True, the situation described by Orwell may not be that of Bengal in its entirety a few years later. However, there was a vogue in Bengal of this literary trend for some time. Several poets had attempted pastoral patterns in and around the years Jasim himself was writing. Kalidas Roy, Kumud Ranjan Mallick, Jatindra Mohan Bagchi, Bande Ali Mian, Gobinda Lal Das, and Wahidul Alam are among the few admired ones. But the success of Jasim Uddin was most remarkable and none could surpass him. The reason perhaps lies in what Verrier Elwin has to say about his *Field of the Embroidered Quilt:*

> It is impossible to read this deeply-moving tale and continue to feel superior or indifferent to the villager who is capable of such passionate love and such deep sorrow. The greatness of a man depends on his power to experience deeply--love or hate, joy or sorrow. Jasim Uddin's villagers rejoice and suffer, desire and are desired, hate and despair from the very depths of their souls; there is nothing trivial about them, nothing superficial: They are real.[11]

NOTES

1. Translation : I would like to paint in such a simple way that strictly speaking, all who has eyes could see it clear.

1A. It seems that his date of birth cannot be ascertained exactly. Many have mentioned this variously as January 1, 1902/1903/1904/1906.

1B. Recently we have learnt that his family title was 'Molla' but the poet did not like to use it.

2. *Memoirs of Dacca University: 1947-1957* (Dhaka: Green Book House, 1973), pp. 29-34.

3. "Introduction," to Jasim Uddin, *Gipsy Wharf (Sojan Bādiyār Ghāt),* trans. Barbara Painter and Yann Lovelock (London: George Allen and Unwin, for UNESCO, 1969), p. 11.

4. For a representative, though not definitive, list of secondary studies on Jasim Uddin see the bibliography of this article.

5. See also a recent article by Abu Hena Mustafa Kamal, "Jasim Uddiner Gadya Shaili," *Uttarādhikār* (a Bangla Academy Journal), Vol. 12, No. 2, April-June 1984, which underlines the importance of the poet's prose.

6. Roman Jakobson: "Notes marginales sur la prose du poete Pasternak," *Huit Questions de Poétique,* Coll. points. Paris: Editions de soleil, 1977, p. 51. Translation : Whether his step be of a touching blunder or that it certifies a consummate skill, one feels that it is not natural to him, it resembles more to the steps of a dancer, the effort is apparent there.

7. Cf. *Jivan-Katha.*

8. As translated and quoted by Barbara Painter, op.cit., p. 15.

9. Ibid.

10. "Inside the Whale," *A Collection of Essays* by George Orwell (New York: Harbrace Paperbound Library, 1953 [1945]), pp. 222-223.

11. "Foreword," *The Field, p.* viii.

BIBLIOGRAPHY

Ahsan, Syed Ali. "Jasimuddin Samparke," *Bai.* Dhaka: National Book Centre, 1983, Vol. XVIII, No. 9, pp. 1-5.

..... and Muhammad Abdul Hai: *Bāngla Sāhityer Itibritta.* Dhaka: Ahmad Publishing House, 6th edition, 1983, pp. 373-37b; 417-418.

Ashraf, Syed Ali. "Banglā Sāhitye Muslim Oitihja," *Bangla Academy Patrika.* Dhaka: Bangla Academy, 1960, Vol. 6, No. 2, pp. 53-92.

Chowdhury, Mofazzal Haydar. "Shishu-Sāhityik Jasimuddin," *Sāhityer Nava Rūpāyan.* Dhaka: Mawla Brothers, 1376 B.S., pp. 134-141.

Elwin, Verrier. "Foreword," in *The Field of Embroidered Quilt.* Dhaka: Oxford University press, 1958.

Hai, Muhammad Abdul. *Bhāsā-O-Sāhitya* (Essays). Dhaka: 1960.

Hussein, Abul. "Sentimentalism in Bengali Literature" in *Contemporary Writing in East Pakistan;* ed., Sarwar Murshid. Dhaka: New Values Publication, 2nd impression, 1960, pp. 23-32.

Islam, A. K. M. Aminul. *Kavi Jasimuddin.* Dhaka, 1957.

Islam, Mustafa Nurul. "Jasimuddin-Ō-Tār Kavitā," *Muslim Bānglā Sāhitya,* 2nd edition. Dhaka.

Jakobson, Roman. "Notes Marginales sur la prose du poète Pasternak," *Huit Questions de Poètique.* Paris: Editions du Seuil, 1977.

Kamal, Abu Hena Mustafa. "Jasimuddiner Kavitā," Jivan-Ō-Shilpa," *Shilpir Rūpāntar.* Dhaka: Barna Michil, 1975, pp. 128-152.

..... "Jasimuddiner Gadyashaili," *Uttarādhikār.* Dhaka: *Bangla Academy Journal,,* Vol. 12, No. 2, April-June 1984.

Lovelock, Yann. "On Translation and on Translating Jasim Uddin," in *Gipsy Wharf,* trans. by Barbara Painter and Yann Lovelock. Appendix II, pp. 187-195.

Maitre, Luce-Claude. "Poétes rebelles du Bengale," *Europe,* Vol. 32, No. 101, pp. 94-104. Paris: May 1954.

Maniruzzaman, Mohammad. "Poet Jasimuddin," *The Bangladesh observer* (daily). Dhaka: April 3, 1976.

..... "Jasimuddin: The Poet Lyricist," in *Radio Bangladesh,* Vol. 3. Dhaka: April 1978.

..... "Kavi Jasimuddin," *Sampratik.* Dhaka: Caitra, 1382.

Milford, E. M. *The Field of the Embroidered Quilt:* A tale of two Pakistani villages; translated from the Bengali poem *Nakshi Kānthār Māth* of Jasimuddin. Dhaka: Oxford University Press, 1958 (first edition 1939).

Morshed, Abul Kalam Manzur. "Jasimuddiner *Rākhāli* Kāvye Shabda Cetanār Ekti Dik," *Samakāl.* Dhaka: Paus, 1383 (B.S.).

Mukhopadhyay, Sunil Kumar. *Jasimuddin.* Dhaka: City Library, second edition, 1973 (1967).

..... "Jasimuddiner Cithi," *Dhākā Digest* (Beng.), Vol. S, No. 3, June 1977, pp. 70-74.

..... *Jasimuddin: Kavimānas-Ō-Kāvya-Sādhanā.* Unpublished Ph.D. dissertation, Dhaka University, 1980.

Orwell, George. "Inside the Whale," *A Collection of Essays.* New York: Harbrace Paperbound Library, 1953.

Painter, Barbara. "Introduction" (About the Author/the Story/the last) in *Gipsy Wharf,* trans. of Jasim Uddin's *Sojan Bādiyār Ghāt* by Barbara Painter and Yann Lovelock. London: George Allen & Unwin for UNESCO, 1969, pp. 11-30.

Qureshi, Mahmud Shah. *Etude sur L'évolution intellectuelle chez les Musulmans du Bengale:* 1857-1947. Paris: Mouton & Co., 1971.

..... *Culture and Development.* Dhaka: National Book Centre, 1983.

Ray, Lila. *A Challenging Decade: Bengali Literature in the Forties.* Calcutta: D. M. Library, 1953.

Stock, A. G. *Memoirs of Dacca University:* 1947-7957. Dhaka: Green Book House, 1973.

Zbavitel, Dusan. *Bengali Literature* (in the series A *History of Indian Literature,* ed. Jan Gonda, Vol. IX, Fasc. 3). Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1976.

Dhaka-Toronto, 1984

লালন ফকীর

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস বহু বিচিত্র ঘটনায় ভরপুর। কিন্তু প্রায় উল্লেখবিহীন একটি বড় ঘটনা এর নব্বই বছর ধরে ফকির লালন শাহের উজ্জ্বল উপস্থিতি (১৭৭৪-১৮৯০)। প্রধানত কুষ্টিয়া-যশোর-নদীয়া জুড়ে তাঁর বহু ভক্ত এক নবতর লোকধর্মের অনুসারী হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসে বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে এবং বহির্বিশ্বে নতুন করে আবিষ্কৃত হলেন লালন শাহ। কিন্তু তাঁর সাধন-সঙ্গীতের মতো তাঁর জীবনধারা এক দুর্ভেদ্য রহস্যের আবরণে আচ্ছাদিত। মৃত্যু-পরবর্তী 'হিতকরী' পত্রিকার প্রবন্ধের পর বসন্ত কুমার পালের রচনা প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী'তে। শুধু কবি নন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ ছাত্র, গ্রামীণ ঐতিহ্যের অনুসারী জসীম উদ্‌দীন সরেজমিনে গবেষণা চালিয়ে এই প্রবন্ধ রচনা করেছেন আটষট্টি বছর আগে। প্রবন্ধটি 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার ৫ম বর্ষ শ্রাবণ ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আজকাল ক্ষেত্র-গবেষণার জন্য আমরা হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে থাকি, জসীম উদ্‌দীনকে সেদিন ফরিদপুর সাহিত্য সমিতি ছয় টাকা অনুদান দিয়েছিলো। এবং তাই খরচ করে তিনি যে মূল্যবান তথ্যাদি আহরণ করেছেন তা গোপন থেকে গেছে। কেননা লালনের ওপর বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও এটি কোথাও উল্লেখিত/সংকলিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রফেসর সোলেমান আলী সরকার এক দশক আগে আমার তত্ত্বাবধানে 'লালন শাহের মরমী দর্শন' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনাকালে আমাকে এই প্রবন্ধের কথা জানান। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেন্দ্র গবেষণা যাদুঘরে এটি সংরক্ষিত আছে। সে সময়ে প্রবন্ধটি কপি করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে উক্ত যাদুঘরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ও গ্রন্থাগার কর্মীর সৌজন্যে, প্রফেসর সরকারের সহযোগিতায় প্রবন্ধটি ফটোকপি করে অবিকল ছাপার ব্যবস্থা করা হলো (*আই.বি.এস. জার্নাল,* ১৪০০:১, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)। এজন্য আমি উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের কাছে কৃতজ্ঞ।

লালনের জীবন কথা জানা সহজ না হইলেও অসম্ভব নয়। কারণ এখনও বহু বৃদ্ধ জীবিত আছেন যাঁহারা লালন সম্পর্কে অনেক খবরই রাখেন।

এদেশের অন্যান্য সাধুপুরুষদিগের জীবন অপেক্ষা লালনের জীবন-কথা জানা আরও সহজ এইজন্য যে, তাঁহাদের জীবনে যেমন নানারূপ অসম্ভব অলৌকিক কাহিনী দ্বারা পরিপূর্ণ লালনের জীবন-কথা তেমন নহে। তাঁর শিষ্যেরা যদিও তাঁহাকে খুব ভক্তি করে কিন্তু তাঁহাকে খোদা বলিয়া জানে না। তাই লালনের জন্মস্থান বাপ মা বাড়ী ঘর তাহাদের ভক্তির উচ্ছ্বাসে দ্বিতীয় নবদ্বীপ হইয়া উঠে নাই। এমনকি লালন কোন্ জাতির ছেলে, কোথায় তার বাড়ী ঘর – ইহাও তাহারা ভাল করিয়া বলিতে পারে না।

তাহারা পাইয়াছে লালনের অসংখ্য গান – সুখে দুঃখে একতারার সুরে সুর মিশাইয়া তাই লইয়া তাহারা সারাটি জীবন কাটাইয়া দেয়।

লালনের মৃত্যুর পর কুমারখালির হিতকরী পত্রিকায় লালন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাহাতে লালনের পূর্ব বৃত্তান্ত এইরূপ :

"সাধারণে প্রকাশ লালন ফকীর জাতিতে কায়স্থ। কুষ্টিয়ার অধীন চাপড়া ভৌমিক বংশীয়েরা ইঁহাদের জ্ঞাতি। ইহার কোন আত্মীয় জীবিত নাই। তিনি নাকি তীর্থ গমনকালে পথে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন। পথে মুমূর্ষু অবস্থায় একটি মুসলমানের নয়া আশ্রয়ে জীবন লাভ করিয়া ফকির হন। ইহার মুখে বসন্তের দাগ বিদ্যমান ছিল।"

সম্প্রতি গত শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'তে বাবু বসন্তকুমার পাল মহোদয় তাঁর সম্বন্ধে যে সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতেও এই বৃত্তান্তের অনুসরণ করা হইয়াছে। এমনকি তিনি লালনের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা কিন্তু লালনের গ্রামের কাহারও কাছে এরূপ বৃত্তান্ত শুনি নাই। তাঁহার বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বের এক বৃদ্ধ তাঁতীর কাছে আমরা লালনের জন্ম বিবরণ এইরূপ শুনিয়াছি –

তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় তাঁর মা তাঁকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ করিতে নবদ্বীপে যান। সেখানে লালন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইলে অভাগিনী জননী তাঁকে নদীর ধারে ফেলিয়া আসেন। নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় যখন শিশুর চৈতন্য ফিরিয়া আসিল তখন প্রভাত হইয়াছে। একটি মুসলমান মেয়ে জল আনিতে নদীতে যাইয়া অতটুকু ছেলেকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাকে তুলিয়া বাড়ীতে লইয়া আসেন। তাঁহারই সেবায় যত্নে এই শিশু দিনের পর দিন বাড়িয়া উঠে। উক্ত স্ত্রীলোকটির গুরু ছিলেন যশোরের উলুবেড়িয়া গ্রামের সীরাজ সাঁই। শিশুটি একটু বড় হইলে সীরাজ সাঁই তাহাকে চাহিয়া লন এবং তাঁহারই শিক্ষার গুণে লালনের লেখাপড়া ও ধর্মজীবনের সূত্রপাত হয় এবং কালক্রমে লালন মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন।

বড় হইয়া তিনি নাকি তাঁর ব্রাহ্মণ মায়ের সাথে দেখা করেন। সমাজের ভয়ে দুঃখিনী মাতা চোখের জল মুছিতে মুছিতে তাঁকে বলেন, 'বাছা তুই যখন মুসলমান হয়েছিস তখন সেইখানেই থাক। কেবল মাঝে মাঝে আমাকে দেখা দিস।' সেই মাতা যতদিন জীবিত ছিলেন লালন তাহাকে মাঝে মাঝে দেখিয়া আসিতেন। লালনের শিষ্য ভোলাই সা'র (শাহের) নিকট আমরা দুইটি ঘটনাই বলিলে তিনি বলিলেন, 'অনেকে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই বলে বটে কিন্তু কেউ প্রকৃত ঘটনা জানে না। যাহা হউক, আর

কিছুদিন পরে লালন সম্বন্ধে কিছু জানা বিশেষ কষ্টকর হইবে জানিয়াই আমরা উপরোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করিলাম। কারণ, যেসব বৃদ্ধ আজও লালন সম্বন্ধে কিছু কিছু জানেন তাঁহারা বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিবেন না। এই ঘটনাটি বিশ্বাস করিবার একটি কারণ আছে এই যে, লালনের সমস্ত গান পড়িয়া দেখিলে তাহাতে হিন্দু প্রভাব হইতে মুসলমান ধর্মের প্রভাব বেশী পাওয়া যায়। সম্প্রতি আমরা লালনের স্বহস্তলিখিত একখানা হাকিমী বই এবং মুসলমানী দোয়া কালাম লেখা একখানা খাতা পাইয়াছি। তাহা পড়িয়া মনে হয় লালন ফারসী কিম্বা আরবী জানিতেন। তাঁর কোন কোন গানে কোরান শরীফের অনেক আয়াতের অংশবিশেষ পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় তিনি কোরান শরীফ পড়িতে পারিতেন। এখন লালন যদি পরিণত বয়সে মুসলমান হইয়া থাকেন তবে, যেসব অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে তিনি থাকিতেন, তাহাতে অত বয়সে মুসলমান শাস্ত্র এতটা যে তিনি কিরূপে আয়ত্ত করিয়া লইলেন, সেটা ভাবিবার বিষয়। আর 'প্রবাসী'র লেখক মহোদয় বলিয়াছেন, লালনের হিন্দু স্ত্রী তাঁহার অনুগামিনী হইতে নিতান্ত উৎসুক ছিলেন, কিন্তু আত্মীয়-স্বজন তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেন নাই। আমরা লালনের শিষ্য ভোলাইর নিকট শুনিয়াছি লালন প্রসিদ্ধ খোন্দকার বংশে বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব ধর্মের স্ত্রীর কথা তাঁরা কিছুই জানেন না।

লালন যখন তাঁর গানে ও জীবনের মহিমায় চারিদিকে বেশ নাম করিয়া উঠিলেন তখন কুষ্টিয়ার সিঁউড়ে গ্রামের অনেকেই তাঁর ভক্ত হইয়া পড়িল। একবার এখানে আসিলে এখানকার তাঁতীরা তাঁকে গ্রামের মধ্যে একখানা ছোট ঘর বাঁধিয়া দিল এবং সেইখানেই তিনি বাস করিতে লাগিলেন। পরে যশোরের উলুবেড়িয়ার অন্তর্গত হরিশপুর গ্রামের জমীর খোন্দকারের কন্যা বিশোকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সিঁউড়ে গ্রামের এক বৃদ্ধের কাছে শুনিয়াছি লালনের দুই স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু ভোলাই সা'র মতে লালনের এক স্ত্রী এবং লালনের কবরের পাশেই তাঁর কবর দেয়া হইয়াছে। বিশোকা অতি বিনয়ী ছিলেন এবং লালনের ভক্তদের তিনি অতি যত্ন করিতেন।

এই সময়ে বহু লোক টাকা-পয়সা ও ফলমূল আনিয়া তাঁহাকে উপহার দিত। বৎসরে ফাল্গুন মাসে তিনি একটি ভাণ্ডারা করিতেন। পাঁচ সাত হাজার লোক এখানে আসিয়া আহার করিত এবং গান গাহিত। এখানে এই ভাণ্ডারার একটি বিবরণ দিই। ইহার আর এক নাম সাধুসেবা। আজও বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে বিশেষ করিয়া নদীয়া যশোর ও পাবনার

অংশবিশেষে এই সাধুসেবা হয়। ইহাতে প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ের ফকীরেরা নিমন্ত্রিত হন। সাধারণত ফকীর ছাড়া আর কারও বাড়ীতে সাধুসেবা হয় না। তবে কেহ কোন ফকীরের শিষ্য হইলে সাধুসেবা করিতে পারেন।

সাধারণত আম কাঁঠালের বাগানের ভিতর একটি বিস্তীর্ণ স্থান পরিষ্কার করা হয়। তাহাতে সারি বাঁধিয়া ছোট ছোট বিছানা করিয়া দেওয়া হয়। মাদুরের উপর কাঁথা ও বালিস এই বিছানার সরঞ্জাম। ইহাকে 'গদী' কহে। এই গদীর উপরে সাধুরা তাঁহাদের শিষ্যগণের সহিত বসিয়া ধর্মালাপ ও গান গাহিয়া থাকেন। সাধারণত বৈকাল বেলায়ই সাধুসেবা আরম্ভ হয়। এক এক দল সাধু ভিন্ন গ্রাম হইতে সভায় আসিয়া সমস্বরে 'আলেক' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ, আল্লা এক। তারপর তাঁহারা যোগ্যতানুসারে সকলকে প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করেন। সন্ধ্যা বেলা 'চাইল পানি' খাইয়া সাধুরা গান করিতে আরম্ভ করেন। যদিও বিভিন্ন দলে ভিন্ন ভিন্ন গান হইয়া থাকে কিন্তু সকল গানের ভিতরই একটা ধারাবাহিকতা থাকে। এক ভাবের গানই সকলকে গাহিতে হয়। যাঁহার গান আর সকলের গানের সহিত মিলিবে না তাঁহাকে আর গাহিতে দেওয়া হয় না। এইসব গানের মধ্যে সময় সময় পাল্লাও লাগিয়া যায়। আজকাল কুষ্টিয়া জেলার পঞ্চুসাম্বর শিষ্যদের সহিত লালনের শিষ্যদের প্রায়ই পাল্লা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, ইহারা স্ব স্ব গুরুর গানই গাহিয়া থাকে। আর ইহাদের গানগুলি এরূপ ভাবে তৈরি যে একজনের গান দিয়া আরেকজনের প্রত্যেকটি গানের উত্তর দেওয়া যায়। এইরূপ গান গাহিতে গাহিতে যখন প্রায় রাত্র দুইটা বাজে তখন একটি লোকে 'আলেক্' এই শব্দ উচ্চারণ করে, আর সমস্ত গান বাদ্যযন্ত্রের মত থামিয়া যায়। তখন ফকীরেরা আহার করিয়া আপনা-আপন গদীতে ঘুমাইয়া থাকে।

পরদিন সকালে গোষ্ঠ গান আরম্ভ হয়। তারপর সকলে প্রাতঃভোজন সমাপ্ত করিয়া গান আরম্ভ করে। মধ্যাহ্ন আহারের পর ফকীরেরা যোগ্যতা অনুসারে কিছু কিছু ভিক্ষা পায়।

লালন যেসব সাধুসেবা করিতেন তাহাতে তখনকার দিনেও তাঁর তিন চারশত টাকা ব্যয় হইত।

গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে সবিশেষ ভক্তি করিত। তাদের সুখে-দুঃখে তিনি চিরসঙ্গী ছিলেন। তিন-চারখানা গ্রামের মধ্যে কারও অসুখ হইলে তিনি ঔষধ দিয়া এবং মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাহার উপশম করিতেন। এইজন্যই

বুঝি তিনি সার-কৌমুদী বলিয়া একখানা কবিরাজী সংগ্রহ-পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি গ্রামের লোকদের তাবিজ ও কবচ দিতেন। লালনের স্বহস্তে লেখা একটুকরা কাগজের একটা মাদুলী আমরা পাইয়াছি। তাঁর সচ্চরিত্র ও নম্র ব্যবহার কি ধনী কি নির্ধন সকলকেই আকর্ষণ করিত। তিনি জীবনে অতি সংযমী ছিলেন। যদিও তিনি আশ্রমে সস্ত্রীক বাস করিতেন তথাপি স্বামী স্ত্রীতে কোনরূপ দৈহিক সম্বন্ধ ছিল না বলিয়া শুনা যায়।

'আখড়ায় ইনি সস্ত্রীক বাস করিতেন। সম্প্রদায়ের মতানুসারে তাঁহার কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই।' – হিতকরী

শিষ্যদিগকে তিনি খুব ভালবাসিতেন। তাঁরাও তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নানারূপ সেবার কার্য দ্বারা তাঁর স্নেহ আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার দুইটি প্রকাণ্ড ঘোড়া ছিল। লালন তাহাতে চড়িয়া নানাস্থানে বেড়াইতেন। তাঁহার শিষ্য ভোলাই সা'র নিকট শুনিয়াছি তাহারা পালাক্রমে এই ঘোড়ার ঘাস কাটিতেন। লালনের শিষ্যদের সম্বন্ধে হিতকরী থেকে আরও জানা যায় –

'আখড়ায় ১৫/১৬ জনের বেশী শিষ্য নাই। শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল ভোলাই নামক দুইজনকে ইনি ঔরসজাত পুত্রের মত স্নেহ করিতেন। অন্যান্য শিষ্যদেরও তিনি কম ভালবাসিতেন না। অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে তাঁহার ভালবাসার বিশেষ কোন তারতম্য থাকা সহজে প্রতীয়মান হইত না। লালনের এইরূপ ভালবাসা পাইয়া ও সদ্‌গুরুর শিক্ষার গুণে শিষ্যরাও প্রকৃত সত্যকার ধর্মজীবন লাভ করিয়াছিলেন।'

সেই সময়ের বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপী অশ্লীলতা ও দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু লালনের জীবনের যে প্রভাব তাঁর শিষ্যদিগের উপর পড়িয়াছিল তাহারই মহিমায় তাহারা সেই যুগের সমস্ত পাপকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে হিতকরী বলিলেন –

'এই সম্প্রদায়ে (লালনের) এতাদৃশ ব্যাভিচার নাই। পরদার ইহাদের পক্ষে মহা পাপ ... বাউল সাধুসেবা ও লালনের মতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যে কোন শ্রেণীতে একটা গুহ্য ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে লালনের দলে ইহাই প্রচলিত থাকায় ইহাদের মধ্যে সন্তান জননের পথ একেবারে রুদ্ধ।'

লালনের শিষ্যদের সম্বন্ধে এত বড় সার্টিফিকেট এখনও প্রযোজ্য কিনা সে বিষয়ে যদিও সন্দেহ আছে তবু তার শিষ্য ভোলাই সাকে দেখিয়া ভক্তি না করিয়া থাকা যায় না। তাঁর সৎ স্বভাবের এবং সুব্যবহারের প্রশংসা সকল গ্রামের লোকই করিয়া থাকে। লালনের শিষ্য শীতলসার একটি পুত্র আছে।

এই ছেলেটিকে তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে যে আদর করেন তাহা দেখিয়া বুক ভরিয়া যায়। লালনের শিষ্যদের যে সন্তান হইত না এ কথাটা হিতকরী সম্ভবত সত্য বলেন নাই। কারণ হিতকরীর মতে লালনের ৪/৫ হাজার শিষ্য ছিল। এতগুলি লোকের অনেকে বিবাহিত থাকা সত্ত্বেও কাহারও সন্তান হয় নাই – এ কথাটি একেবারে অসম্ভব। আর লালনের বর্তমান প্রধান শিষ্য ভোলাই এর পিতামাতা লালনের শিষ্য ছিলেন।

লালনের ধর্মমত সম্বন্ধে হিতকরী বলে – "বাস্তবিক ধর্ম সাধনে অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্মের সার তত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না। লালন ফকীর নিজে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মাবলম্বী ছিলেন না। অথচ সকল ধর্মের লোকই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার আহার ব্যবহার থাকায় অনেকে তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত। বৈষ্ণব ধর্মের মত পোষণ করিতেন বলিয়া হিন্দুরা তাঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত। জাতিভেদ মানিতেন না, নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে ইহাকে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু ইহাকে ব্রাহ্ম বলিবার উপায় নাই। কারণ ইনি বড় গুরুবাদ পোষণ করিতেন।"

লালনকে যেমন ব্রাহ্ম বলিবার উপায় নাই তেমনি হিন্দু কিম্বা মুসলমান বলিবারও উপায় নাই। কারণ কোন ধর্মমতকেই তিনি একেবারে গ্রহণ করেন নাই। আবার কোন ধর্মমতকেই তিনি একেবারে বর্জনও করেন নাই। বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণের লীলার অনেক গান তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

'বলরে বলাই তোদের ধারণ কেমন হারে
তোরা ঈশ্বর বলিস যারে কান্ধে চড়িস তারে
বল কোন বিচারে?'

ব্রজরাখালের এই সহজ সুন্দর সারল্যে তিনি বিভোর হইয়া গিয়াছেন। আজও পল্লী রাখালেরা গোধূলীলগ্নে গোখুর ধূলায় স্নান করিতে করিতে আকাবাঁকা গ্রাম্যপথে গরুর গলার ঘণ্টা বাজার তালে তালে গাহিয়া যায় –

আমি পথের পদ চিহ্ন পাই।
কোন বনে গেলিরে কানাই? ও তুই দাঁড়ারে।
তোর মা দুখিনী কেন্দে ছাড়ে হাঁই
দিবসে অন্ধীকার হৈল কানাই ঘরে নাই
ও তুই দাঁড়ারে।

এগুলি শুনিয়া এখনও অনেক বৈষ্ণবের চোখে জল আসে। কিন্তু ধর্মের ঔদার্যের যে স্পর্শ তিনি পাইয়াছিলেন আপন জীবনে তাহার প্রভাব তাঁকে ব্রজের ধূলায়ই আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। সেখানেও তিনি সেই বাঁধনহারা সীমাহারা অনাদি অনন্ত ব্রহ্মের সন্ধান করিতে যাইয়া গাহিয়াছেন –

অনাদি আদি শ্রীকৃষ্ণ নিধি
তার কি আছে কভু গোষ্ঠ লীলা
ব্রহ্মরূপে সে অটলে বসে
লীলাকারী তারই অংশ কলা
সত্য সত্যশরণ বেদাগমে কর
চিদানন্দরূপ পূর্ণ ব্রহ্মময়
জন্মমৃত্যু তার নাহি ভবের পরে
তবে সাঁই স্বয়ং পাই নন্দলালায়।

এই অসীম অনন্তকে তবে কেমন করিয়া পাইব? লালন সে পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

দরবেশের দেলদরিয়া অন্ধাই
অজান খবর সেহি জানতে পায়
ভজ দরবেশ পাবে উপদেশ
লাল বলে তার উজল হৃদ কমলা

এই 'উজল হৃদ-কমলা' যাঁর তাঁকে গুরু করিয়া ভজনা করিলে সেই অনাদিকে পাওয়া যাইবে। এই গুরুকে ভজন করিতে যাইয়া লালন মুসলমান সাধনধারার 'পীর-ভক্তিকে' ছাড়াইয়া গিয়াছেন। এখানে আসিয়া বৈষ্ণব 'সহজিয়া' সম্প্রদায়ের গুরুবাদকে তিনি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই মানুষ ভজনের সাধন পদ্ধতিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে মুসলমানী কেতাব হইতে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া ইহাকে তিনি আরও লোকপ্রিয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাতে মুসলমান ধর্মের প্রতি তাঁর যে আন্তরিক একটি টান ছিল তাহা বুঝা যায়। কারণ নিজের ধর্মমতকে তিনি মুসলমান ধর্মের সাথে মিলাইয়া লইতে প্রয়াস পাইয়াছেন –

শুনতে পাই চাইর কারের আগে
সাঁই-আশ্রয় করেছিলেন রাগে
এবে সে অটল রূপ ঢেকে
মানুষ রূপ লীলা জগতে দেখায়।

লামে আলেক লুকায় যেমন
মানুষে সাঁই আছেন তেমন
তা নইলে কি সব নুরীস্তন
আদম তনের 'সেজদা সালাম' জানায়।

সৃষ্টির প্রথমে সমস্ত ফেরেস্তারা আদমকে সেজদা ও সালাম করিয়াছিল। আজাজিল মানুষকে তুচ্ছজ্ঞানে 'সেজদা' করিল না। তাই তার সব জপতপ বৃথা গেল। শয়তান হইয়া সমস্ত বিশ্বের অভিসম্পাৎ সে কুড়াইতে লাগিল। তাই মানুষকে না ভজিলে খোদাকে পাওয়া যাবে না। কারণ –

স্বয়ং রূপ দর্পণে ধরে মানব রূপ সৃষ্টি করেছে
দিব্য জ্ঞানী যারা ভাবে বোঝে তারা
মানুষ ধ'রে কার্য সিদ্ধ কার লয়।

কিন্তু মানুষকে ধরিলেই কি খোদাকে পাওয়া যাইবে? মানুষ ভজিতে যাইয়া সীমার মধ্যেই ত ডুবিয়া যাইব। সেই 'অনাদি অনন্ত'কে ধরিব কেমন করিয়া? লালন কেমন জলের মত প্রশ্নটির উত্তর দিতেছেন। শুনুন –

যেমন, মূল হ'তে হয় ডালের সৃজন
ডাল হ'তে পায় মূল অন্বেষণ হে
তেমনি রূপ হ'তে স্বরূপ
তারে ভেবে রূপ
অধীন লালন সদা নিরূপ ধরতে চায়।

ধরিতে গেলে, 'সীমার মাঝে অসীম তুমি' বলিতে রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এই মানুষ ভজনের রীতি লালনই নূতন বলে নাই। ইহার পূর্বে লুই সীদ্ধাই হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডীদাস পর্যন্ত অনেকেই এই মানুষ ভজনের বীজ বাংলার মাটিতে বপণ করিয়া গিয়াছিলেন।

চণ্ডীদাস কহে শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ ভজন তাহার উপরে নাই।

তাই লালনের এই মত মুসলমান সমাজের ধর্ম নীতির সাথে খাপ না খাইলেও বাংলার মাটিতে ইহা অসহ্য হইল না।

যদিও লালন তার মানুষ ভজনের পদ্ধতি মুসলমান পৌরাণিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার মতের সাথে মেলে না, মুসলমান শাস্ত্রের এমন বচন সকলের তিনি প্রতিবাদ করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহার যুগে নিজের মত এরূপ নির্ভীকভাবে প্রচার করা কম সাহসের কাজ

নয়। তাহার জন্য লালনকে কম সংগ্রাম করিতে হয় নাই। সে কথা পরে বলিতেছি।

এই মানবদেহই যখন তাঁর কাছে সবার চাইতে বড় বলিয়া মনে হইল তখন বাহিরের মক্কা মদিনায় যাইয়া তাঁর কোন্ প্রয়োজন?

আছে আদ্‌মক্কা এই মানবদেহে
দেখনারে মন ভেবে
দেশ দেশান্তর দৌড়িয়ে এবার
মরিস কেন হাঁপিয়ে
করে অতি আজব তাক্কা
গম্বঠেছে সাই মানুষ মাক্কা।

আর একটা গানে এই মক্কা সম্বন্ধে লালন বলিতেছেন –

গুপ্তপুরে হজ হতেছে
ষোলজন গুণরী আছে
দ্বারবানে চার জনে

এই মক্কায় হজ করিবার সত্যকার সন্ধানটি লালন পাইয়াছিলেন –

কুরমানের ময়দানে যাও
নিজেকে কুরমানী দাও।
নবীজির ফরমানে
তবে তুই হবি হাজি
আল্লাজী হবে রাজী।
খোদে খেদ বলে।

বহুদিন পূর্বেই লালন কোরবানী সম্বন্ধে যেরূপ অর্থ করিয়া গিয়াছেন এরূপ কোরবানী বা বলিদান হিন্দু বা মুসলমান সকলেরই শাস্ত্রসঙ্গত।

রোজা নামাজ যা নাকি মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য সে সম্বন্ধে লালন কি বলিতেছেন শুনুন –

না পড়িলে দায়মী নামাজ
সেকি রাজি হয়
কোথায় খোদা কোথায় সেজদা –
করি সদার।
মাস্তা আহুদ কারা রাহু
বুঝিতে হয় বোঝ কেহ
দিন বয়ে যায়
এক আয়াত কর তফাক করণ

বোঝ তার মাতেন কেমন
কুলুর বলদের মত ঘুরার কাজ নয়।

অর্থাৎ খোদাকে সাক্ষাৎ ভাবে জানিয়া তবে নামাজ পড়িতে হইবে। এখন এই সাক্ষাৎ ভাবে সেই অসীম অনন্তকে কিরূপে জানিব? সুতরাং তাহাকে সাক্ষাৎ না জানিয়া সাধারণে যে নামাজ পড়ে উহাতে খোদাকে পাওয়া যাইবে না।

এমনকি লালন হজরত মহম্মদকেও (দঃ) আসল মহম্মদ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তাঁর মতে খোদার নুরে মহম্মদের সৃষ্টি হইল আর মহম্মদের নুরে জগৎসংসারের সৃষ্টি হইল। অতএব সৃষ্টি তাঁর কাছে সন্তানতুল্য। জন্মগ্রহণ করিয়া সেই মহম্মদ (দঃ) আপন সন্ততিকে বিবাহ করিলেন কেমন করিয়া? তবে আসল মহম্মদ (দঃ) কে?

আসমান জমীন জলাদি পবন
যে নবির নুরে হয় সৃজন
কি সে ছিল সেই নবির আসন
নবি পুরুষ কি প্রকৃতি ছিল ততক্ষণে।

তবে এই নবিই কি মহম্মদ (দঃ) হইয়া মদিনায় আসিয়াছিলেন? লালন বলিতেছেন –

যে নবি পারের কাণ্ডার
জেন্দা সে চাইর কারের উপর
ছায়াতল মোর ছলিম নাম তার
সেই জন্যে কয়।

তাই মদিনার মহম্মদ (দঃ) আসল মহম্মদ (দঃ) নয়। কেননা সত্যকার নবি চার কারের (অন্ধকার, নৈরাকার, ধন্দকার, কুয়াকার) উপরেও জীবিত আছেন। তাঁর মরণ নাই। তাই লালন দুই নবিকে পৃথক করিয়া দেখাইতেছেন।

কোন্ নবি হ'লো উফাৎ
কোন্ নবি বান্দার ছয়াৎ
নিহাস করে জানলে নেহাস
যাবে সংশয়।

সেই সত্যকার নবি তবে কোথায় আছেন? লালন তাঁহার সন্ধান পাইয়াছেন –

যে নবি অঙ্গে তোরো
চিনে তার দাওন ধর

লালন বলে পারের কারও
সাধ যদি হয়।

ফল কথা এই দেহের মধ্যেই লালন তাঁর সকল খুঁজিয়া পাইয়াছেন। খোদাকে তালাস করিতেও লালন বাহিরে ঘুরিবেন না –

যারে আকাশপাতাল খুঁজে মরিস
এই দেহে সে রয়।

তাঁহাদের ভাবের উচ্ছ্বাস ও দরগাতলায় গড়াগড়িকে লালন অনেক ঠাট্টা করিয়াছেন –

অথবা
'যদি ভজবিরে লাসরি কালা
কেনে ঘুরে বেড়াও কালকে তলা
বুঝি খাবিরে নৈবিদ্যি কলা
করছাও এইডা ফিকিরী'
অথবা
যার দরগাতলা মন ম'জেছে
সেকি ভাবের ভাব পারছে

বস্তুত ভাবকে সংযমে আনিয়া সাধনের স্তর হইতে স্তরে উঠাই লালনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তার জন্য শুধু নাকি কান্না করিলে চলিবে না। একান্তে বসিয়া নিভৃত সাধনা চাই। তার গানগুলি ভরিয়া এই সাধন পথের বর্ণনাই লালন করিয়া গিয়াছেন –

যে পথে সাই চলে ফেরে
তার অন্বেষণ কে করে
বিষম কালনাগিনীর ভয়
অমনি উঠে ছোঁ মারে

এই পথে চলিবার জন্য বাউল সম্প্রদায়ে যেসব গোপনীয় সাধন প্রণালী আছে, তাহা কেবল আত্মসংযম ব্যতীত আর কিছু নহে। এক কথায় ইহাকে ব্রহ্মচর্য বলা যাইতে পারে।

চণ্ডীদাসের সেই –
জলেতে নামিবে জল না ছুঁইবে

উপদেশটি লালন পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এক সময়ে নারীকে বাদ দিয়া সাধনের পথ এ দেশের সাধু মহাজনেরা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু নরনারীর মিলন, মানব প্রকৃতির এই চিরন্তন সত্যটিকে অতিক্রম করিবার

শক্তি যে মানুষের নাই এ কথাটিকে তাঁহারা অনেক আত্মলাঞ্ছনায় অনুভব করিয়াছিলেন। লালনের সাধনের পথ তাই –

'রসিকের তেমনি করণী
মারে মৎস্য না ছোঁয় পানি
ও সে আকর্ষণে আনে টানি
ক্ষীরোদ শশী।'

তাই যাদের –

'মন মাতঙ্গ মদন রসে
সদাই ফেরে সেই আবেশে'

তাদের –

'লালন বলে শুধু মিছে
লবলবানি প্রেমতলা'

যদিও আমরা পূর্বে বলিয়াছি লালনের গান রচনার উদ্দেশ্য ছিল তত্ত্বকথার প্রচার করা, কবিত্ব ফুটাইয়া তুলা নয়। তবুও মাঝে মাঝে এই কঠোর তত্ত্বকথার ফাঁক দিয়া কবিতাসুন্দরী তার স্বর্ণকমলের শতদল মেলিয়া ধরিয়াছে।

যেমন –

এক নিরিখে দেখ ধনী
সৃর্জ্জগৎ কমলিনী
দিনে বিভাসিত তেমনি
নিশীতে মুদিত রহে

অথবা –

লালা দেখে লাগে ভয়
নৌকার উপর গঙ্গা বোঝাই
ডেঙ্গা বয়ে যায়

০ ০ ০

ফুল ফোটে তার গঙ্গাজলে
ফল ধরে তার অচীন দলে
যুক্ত হয় সে ফুলে ফুলে
তাতে কয় কথা।

প্রভৃতি পদে যদিও মানুষের জন্মতত্ত্ব প্রচার করা হইয়াছে তবুও বাহির হইতে ইহার কবিত্ব আমাদিগকে মুগ্ধ করে।

বাংলার একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন, তাঁর জীবনের অনেক মহিমা অনেক প্রভাব লইয়া নিভৃত পল্লীক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন – তাঁর জীবনের বহু শিক্ষাপূর্ণ ঘটনা, বহু সঙ্গীত আজও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। সেগুলি যে আমাদের জাতীয় জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাম্য গান সংগ্রহ করিতে লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। এদিকেও কি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি না?

* এই প্রবন্ধের মালমসলা সংগ্রহ করিতে ফরিদপুর সাহিত্য সমিতি আমাকে ৬ টাকা সাহায্য করিয়াছেন এবং উক্ত সমিতির শ্রদ্ধেয় সম্পাদক বাবু অবনীমোহন চক্রবর্তী এবং বাবু কিরণচন্দ্র ঘোষ মহোদয় আমাকে নানা দিক দিয়া উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রী জসীম উদ্‌দীন

পদ্মা নদীর তীরে আমাদের বাড়ি। সেই নদীর তীরে বসিয়া নানা রকমের কবিতা লিখিতাম, গান লিখিতাম, গল্প লিখিতাম। বন্ধুরা কেউ সে সব শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, কেউবা সামান্য তারিফ করিতেন। মনে মনে ভাবিতাম, একবার কলিকাতায় যদি যাইতে পারি, সেখানকার রসিক-সমাজ আমার আদর করিবেনই। কতদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছি, কলিকাতার মোটা মোটা সাহিত্যিকদের সামনে আমি কবিতা পড়িতেছি। তাঁহারা খুশি হইয়া আমার গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিতেছেন। ঘুম হইতে জাগিয়া ভাবিতাম, একটিবার কলিকাতা যাইতে পারিলেই হয়। সেখানে গেলেই শত শত লোক আমার কবিতার তারিফ করিবে। কিন্তু কি করিয়া কলিকাতা যাই? আমার পিতা স্কুলের মাস্টারি করিতেন। ছেলেরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে এইরূপ আকাশকুসুম চিন্তা করে, তাহা তিনি জানিতেন। কিছুতেই তাঁহাকে বুঝানো গেল না, আমি কলিকাতা গিয়া একটা বিশেষ সাহিত্যিক খ্যাতি লাভ করিতে পারিব। আর বলিতে গেলে প্রথম প্রথম তিনি আমার কবিতা লেখার উপরে চটাও ছিলেন। কারণ পড়াশুনার দিকে আমি বিশেষ মনোযোগ দিতাম না; কবিতা লিখিয়াই সময় কাটাইতাম। তাতে পরীক্ষার ফল সবসময় ভালো হইত না।

তখন আমি প্রবেশিকার নবম শ্রেণীতে কেবলমাত্র উঠিয়াছি। চারিদিকে অসহযোগ-আন্দোলনের ধুম। ছেলেরা স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া স্বাধীনতা আন্দোলনে নামিয়া পড়িয়াছে। আমিও স্কুল ছাড়িয়া বহু কষ্ট করিয়া কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমার দূর-সম্পর্কের এক বোন কলিকাতায় থাকিতেন। তাঁর স্বামী কোনো অফিসে দপ্তরির চাকুরি করিয়া মাসে কুড়ি টাকা বেতন পাইতেন। সেই টাকা দিয়া অতি কষ্টে তিনি সংসার চালাইতেন। আমার এই বোনটিকে আমি কোনোদিন দেখি নাই। কিন্তু অতি আদরের সঙ্গেই হাসিয়া তিনি আমাকে গ্রহণ করিলেন। দেখিয়াই মনে হইল, যেন কত কালের স্নেহ আদর জমা হইয়া আছে আমার জন্য তাঁহার হৃদয়ে। বৈঠকখানা রোডের বস্তিতে খোলার ঘরের সামান্য স্থান লইয়া তাঁহাদের বাসা। ঘরে সঙ্কীর্ণ জায়গা, তার মধ্যে তাঁদের দুইজনের মতন চৌকিখানারই শুধু স্থান হইয়াছে। বারান্দায় দুই হাত পরিমিত একটি স্থান, সেই দুই হাত জায়গায় আমার বোনের রান্নাঘর। এমনি সারি সারি সাত-আট ঘর লোক পাশাপাশি থাকিত।

সকাল-সন্ধ্যায় প্রত্যেক ঘরে কয়লার চুলা হইতে যে ধূম বাহির হইত, তাহাতে ওইসব ঘরের অধিবাসীরা যে দম আটকাইয়া মরিয়া যাইত না – এই বড় আশ্চর্য মনে হইত। পুরুষেরা অবশ্য তখন বাহিরে খোলা বাতাসে গিয়া দম লইত, কিন্তু মেয়েরা ও ছোট ছোট বাচ্চা শিশুরা ধূয়ার মধ্যেই থাকিত। সমস্তগুলি ঘর লইয়া একটি পানির কল। সেই কলের পানিও স্বল্প-পরিমিত ছিল। সময়মতো কেহ স্নান না করিলে সেই গরমের দিনে তাহাকে অস্নাত থাকিতে হইত। রাত্রে এঘরে-ওঘরে কাহারও ঘুম হইত না। আলো-বাতাস বঞ্চিত ঘরগুলির মধ্যে যে বিছানা-বালিশ থাকিত, তাহা রৌদ্রে দেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। সেই অজুহাতে বিছানার আড়ালে রাজ্যের যত ছারপোকা অনায়াসে রাজত্ব করিত। রাত্রে একে তো গরম, তার উপর ছারপোকার উপদ্রব। কোনো ঘরেই কেহ ঘুমাইতে পারিত না। প্রত্যেক ঘর হইতে পাখার শব্দ আসিত, আর মাঝে মাঝে ছারপোকা মারার শব্দ শোনা যাইত। তাছাড়া প্রত্যেক ঘরের মেয়েরা সূক্ষ্মভাবে পরদা মানিয়া চলিত, অর্থাৎ পুরুষেরাই যার যার ঘরে আসিয়া পরদায় আবদ্ধ হইত। প্রত্যেক বারান্দায় একটি করিয়া চটের আবরণী। পুরুষলোক ঘরে আসিলেই সেই আবরণী টাঙাইয়া দেওয়া হইত। দুপুরবেলা যখন পুরুষেরা অফিসের কাজে যাইত, তখন এঘরের ওঘরের মেয়েরা একত্র হইয়া গালগল্প করিত, হাসি-তামাশা করিত, কেহ বা সিকা বুনিত, কেহ কাথা সেলাই করিত। তাহাদের সকলের হাতে রঙবেরঙের সুতাগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নকশায় পরিণত হইত। পাশের ঘরের সুন্দর বউটি হাসিয়া হাসিয়া কখনও বিবাহের গান করিত, বিনাইয়া বিনাইয়া মধুমালার কাহিনী বলিত। মনে হইত, আল্লার আসমান হইতে বুঝি এক ঝলক কবিতা ভুল করিয়া এখানে ঝরিয়া পড়িয়াছে।

তখন নজরুল থাকিতেন কলেজ স্ট্রীটে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য-সমিতির আফিসে। গিয়া দেখি, কবি বারান্দায় বসিয়া কি লিখিতেছেন। আমার খবর পাইয়া তিনি লেখা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলাম, 'আপনি লিখছিলেন – আগে আপনার লেখা শেষ করুন, পরে আপনার সঙ্গে আলাপ করব। আমি অপেক্ষা করছি।' কবি তাঁহার পূর্ব লেখায় মনোনিবেশ করিলেন। আমি লেখন-রত কবিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কবির সমস্ত অবয়বে কি যেন এক মধুর মোহ মিশিয়া আছে। দুটি বড় বড় চোখ শিশুর মতো সরল। ঘরের সমস্ত পরিবেশ নিরীক্ষণ করিয়া আমার ইহাই মনে হইল, এত কষ্টের তিনটি পয়সা খরচ করিয়া

কিস্তি-টুপিটি না কিনিলেও চলিত। কবির নিজের পোশাকেও কোনো টুপি-আচকান-পায়জামার গন্ধ পাইলাম না।

অল্প সময়ের মধ্যেই কবি তাঁহার লেখা শেষ করিয়া আমার নিকট চলিয়া আসিলেন। আমি অনুরোধ করিলাম, 'কী লিখেছেন আগে আমাকে পড়ে শোনান।' কবি পড়িতে লাগিলেন :

হার-মানা হার পরাই তোমার গলে ... ইত্যাদি

কবি-কণ্ঠের সেই মধুর স্বর এখনও আমার কানে লাগিয়া আছে। কবিকে আমি আমার কবিতার খাতাখানি পড়িতে দিলাম। কবি দুই-একটি কবিতা পড়িয়াই খুব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। আমার কবিতার খাতা মাথায় লইয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন। আমার রচনার যে স্থানে কিছুটা বাক্‌পটুত্ব ছিল, সেই লাইনগুলি বারবার আওড়াইতে লাগিলেন।

এমন সময় বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয় কবির সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তখন বিশ্বপতিবাবুর 'ঘরের ডাক' নামক উপন্যাস প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে বাহির হইতেছে। দুই বন্ধুতে বহু রকমের আলাপ হইল। কবি তাঁহার বহু কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। সেদিন কবির মুখে তাঁহার পলাতকা নামক কবিতাটির আবৃত্তি শুনিয়া বড়ই ভালো লাগিল :

'আচমকা কোন্ শশক-শিশু চমকে ডেকে যায়,
ওরে আয়
আয়রে বনের চপল চখা,
ওরে আমার পলাতকা।
ধানের শীষে শ্যামার শিষে
যাদুমণি বল সে কিসে'
তোরে কে পিয়াল সবুজ স্নেহের কাঁচা বিষে রে।

এই কবিতার অনুপ্রাস-ধ্বনি আমাকে বড়ই আকর্ষণ করিয়াছিল। আজ পরিণত বয়সে বুঝিতে পারিতেছি কবিতার মধ্যে যে করুণ সুরটি ফুটাইয়া তুলিতে কবি চেষ্টা করিয়াছেন, অনুপ্রাস তাহাকে কতকটা ক্ষুণ্ন করিয়াছে। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না নজরুলের বয়স তখন খুবই অল্প।

গল্পগুজব শেষ হইলে কবি আমাকে বলিলেন, 'আপনার কবিতার খাতা রেখে যান। আমি দুপুরের মধ্যে সমস্ত পড়ে শেষ করব। আপনি চারটার সময় আসবেন।'

কবির নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিলাম। কিন্তু কবির ব্যক্তিত্ব, স্নেহ আর মধুর ব্যবহার আমার অবচেতন মনে কাজ করিতে লাগিল। কোনো

অশরীরী ফেরেশতা যেন আমার মনের বীণার তারে তাহার কোমল অঙ্গুলি রাখিয়া অপূর্ব সুর-লহরির বিস্তার করিতে লাগিল। তাহার প্রভাবে সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি, এমনকি, কলিকাতার নোংরা বস্তি, গাড়ি-ঘোড়া ট্রামও আমার কাছে অপূর্ব বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

চারিটা না বাজিতেই কবির নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, কবি আমারই কবিতার খাতাখানা লইয়া অতি মনোযোগের সঙ্গে পড়িতেছেন। খাতা হইতে মুখ তুলিয়া সহাস্যে তিনি আমাকে গ্রহণ করিলেন। অতি মধুর স্নেহে বলিলেন, 'তোমার কবিতার মধ্যে যেগুলি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে, আমি দাগ দিয়ে রেখেছি। এগুলি নকল করে তুমি আমাকে পাঠিয়ে দিও। আমি কলিকাতার মাসিক পত্রগুলিতে প্রকাশ করব।'

... দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, আমার মা আমার জন্য চিন্তা করিয়া শুকাইয়া গিয়াছেন। পিতা নানা স্থানে আমার সন্ধান না পাইয়া খোঁজখবর লইয়া অস্থির। আজীবন মাস্টারি করিয়া ছেলেদের মনোবিজ্ঞান তাঁর ভালোভাবেই জানা ছিল। তিনি জানিতেন চোদ্দ-পনর বৎসরের ছেলেরা এমনি করিয়া বাড়ি হইতে পলাইয়া যায়। আবার ফিরিয়া আসে। সেইজন্য তিনি আমার ইস্কুলের বেতন ঠিকমতো দিয়া আসিতেছিলেন।

মা আমাকে সামনে বসাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। বাড়ির আম সেই কবে পাকিয়াছিল, তাহা অতি যত্নে আমার জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। অর্ধেক পচিয়া গিয়াছে তবু ছোট ভাইবোনদের খাইতে দেন নাই, আমি আসিলে খাইব বলিয়া।

আবার ইস্কুলে যাইতে লাগিলাম। নজরুল ইসলাম সাহেবের নিকট কবিতার নকল পাঠাইয়া সুদীর্ঘ পত্র লিখিলাম। কবির নিকট হইতে কবিতার মতোই সুন্দর উত্তর আসিল। কবি আমাকে লিখিলেন –

'ভাই শিশুকবি, তোমার কবিতা পেয়ে সুখী হলুম। আমি দখিন হাওয়া। ফুল ফুটিয়ে যাওয়া আমার কাজ। তোমাদের মত শিশু কুসুমগুলিকে যদি আমি উৎসাহ দিয়ে, আদর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারি, সেই হবে আমার বড় কাজ। তারপর আমি বিদায় নিয়ে চলে যাব আমার হিমগিরির গহন বিবরে।'

[যাঁদের দেখেছি, ঢাকা, পলাশ প্রকাশনী, ১৯৯৯, অংশবিশেষ : পৃষ্ঠা ৭-৮, ১৮-২২]

বাংলা একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত বাংলা সাহিত্য সম্মেলন ১৯৭৪-এর মূল সভাপতি কবি জসীম উদ্‌দীন-এর উদ্বোধনী দিবসের ভাষণ

বহুদূর হইতে আগত স্বগোত্রীয় শিল্প-সাহিত্য সাধকগণ, বিভিন্ন জনপদে অবস্থিত বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ পূজারীগণ, আপনাদের সৃষ্টির সৌরভে আজ দিকদিগন্ত আমোদিত। আপনারা একান্ত তপস্যায় দিনের পর দিন সাহিত্য-ভারতীর পদমূলে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছেন কালস্রোতে ভাসিয়া তাহা নানা দেশের জনপদবাসীর রস-পিপাসায় অমৃত বর্ষণ করিতেছে। আপনাদের এই মহতী-মণ্ডলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমি নিজেকে বড়ই অক্ষম মনে করিতেছি। যে সম্মান আপনারা আমাকে দিয়াছেন আমি তার অযোগ্য সেবক। ইতিপূর্বে ইত্যাকার সম্মানের আরও দু-একবার আহ্বান পাইয়াছি, কিন্তু তাহাতে সাড়া দিতে পারি নাই।

আজ এই মহতী সভার মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে আমার কিছু বক্তব্য তুলিয়া ধরিতে পারিব, সেই আশায় আজ গিরিলঙ্ঘনের দুরাশা লইয়া আপনাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। অনুরোধ, আপনারা সহানুভূতির সঙ্গে আমার কথাগুলি অনুধাবন করিবেন। হয়তো এই কথাগুলির কিছু কিছু আপনাদের মনেও জাগিয়া থাকিতে পারে।

ইহা বলিবার আগে বাঙলা ভাষা আন্দোলনে যাঁহারা শহীদ হইয়াছেন সেই সালাম, বরকত, রফিক এঁদের সবাইকে স্মরণ করিতেছি। আজ এই সভায় সবচাইতে যাঁহারা অগ্রণী হইয়া আপনাদের প্রতি সাদর সম্ভাষণ জানাইত সেই শহীদুল্লাহ কায়সার, জহির রায়হান, মুনীর চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, মোফাজ্জল হায়দার, শহীদ সাবের, আ.ন.ম. গোলাম মোস্তফা, সিরাজউদ্দীন হোসেন, জহিরুল ইসলাম, ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব প্রমুখ বহু সাহিত্য-সাধক আজ আর আমাদের মধ্যে নাই। তাঁহারা গত স্বাধীনতা আন্দোলনের বলি হইয়াছেন। তাঁহাদের অভাবে আজ আমাদের সাহিত্যের হাট ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

সেবার ১৯৬৯ সনে কলিকাতা যাইয়া আমি গর্ব করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলাম, আর আমরা আমাদের সমাজ জীবনের কাহিনী লইয়া নাটক নভেল লিখিতে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকদের অনুরোধ করি না। আমাদের

জীবন লইয়া আমাদের সাহিত্য-সাধকেরাই অপূর্ব নাটক উপন্যাস রচনা করিতেছেন। কিন্তু আজ আমার সে গর্ব চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহাদের চলিয়া যাওয়ার পরে আজও আমরা সেই ভাঙা হাট জোড়া লাগাইতে পারি নাই।

তবু আমরা আশাভঙ্গ হই নাই। বাঙলা ভাষার মর্যাদা রক্ষাকল্পে বীর শহীদানেরা ইহার ললাটে যে রক্ততিলক পরাইয়া গিয়াছেন তাহার আলোকে আমরা আবার নব নব উদ্যমে সাহিত্য সাধনা আরম্ভ করিয়াছি।

এদেশের অমর শহীদদের জীবনদানের স্মরণীয় অক্ষরে আমি আপনাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেছি।

পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, শীতলক্ষ্যা, কর্ণফুলী নদীর সুশীতল বারিধারায় আপনারা আপ্লুত হোন। শানাল পীর, লালন ফকীর, মাইজভাণ্ডার, পাগলা কানাই প্রভৃতি মহামানুষের সঙ্গে এদেশের অগণিত লোকসাহিত্য-সাধকদের দোতারা সারিন্দার সুললিত সুরধ্বনি আজ আপনাদের উপর বর্ষিত হোক। দেশ-দেশান্তরের বর্তমান ও অতীতের রস-স্রষ্টারা আজ আমাদের অন্তরে আসিয়া ভর করুন। এই দেশের উদাস প্রান্তর, নদীনালা, সুন্দর বনভূমি আপনাদের জন্য সতত আশাবাণী উচ্চারণ করিতেছে।

ইতিপূর্বে এই দেশের যাহারা সীমান্ত পার হইয়া গিয়াছিল, যাহারা দেশের অভ্যন্তরে থাকিয়া বিগত স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগ দিয়াছিল, সেই কার্যের ভিতর উত্তেজনা ছিল, রোমাঞ্চ ছিল – জীবনদানের মহামহিমা ছিল।

কিন্তু আজকের কাজ অন্য ধরনের। বাউল কবি বলিয়াছেন :

রসিক যারা জ্যান্ত মরা, মরার আগে মরে তারা।

আজ ভাষার কামারশালায় বসিয়া কথার স্বর্ণকারেরা কথাকে বাঁকাইয়া ঘুরাইয়া একের সঙ্গে অপরকে মিশাইয়া আপনাপন রচনাকার্যে নিয়োজিত। এই কাজে যদিও আত্মতৃপ্তি আছে কিন্তু বাহিরের উত্তেজনা নাই। নীরব ধ্যানলোকে বসিয়া মানব মনের রসতৃপ্তির কুসুম রচনা করিতে হয়।

এই সাধনায় কতকগুলি পরিপন্থী আসিয়া আমাদের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাইতেছে। তাহা আপনাদের কাছে নিবেদন করিব।

ইতিপূর্বে এদেশের অগণ্য জনগণের নয়নমণি সাধারণ মানুষের অতীব সাধারণ নেতা বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিগতভাবে বহু সাহিত্য-কর্মীকে ও গুণীজনকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। দেশের গুণীব্যক্তিদের প্রতি তাঁহার সংবেদনশীল মন সর্বদাই প্রসারিত। তাঁহার মুখে অনেকবার শুনিয়াছি, 'ওঁরা মানুষ নন, ওঁরা দেবতা।'

ইতিপূর্বে কোন লেখক-শিল্পীদের প্রতিনিধিদল তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের কথা বলেন নাই। তাই তিনি এদিকে সম্যক দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। আজ আপনাদের মাধ্যমে তাঁহার নিকট আমাদের অভাব-অভিযোগের কথা বলিবার সুযোগ পাইব। এর আগে তিনি লেখক ট্রাস্ট গঠন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কাগজ সাহিত্যের বাহন। কাগজের ঘুড়িতে মনের কথা লিখিয়া আমরা সারা দেশে উড়াইয়া দেই। দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারে পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কাগজের স্থান যে-কোন নামজাদা অধ্যাপকের চাইতে অনেক উচ্চে। কাগজকে আমি এককথায় চলন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে পারি।

এই কাগজ ধীরে ধীরে দেশবাসীর কাছে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। সরকার নিয়ন্ত্রিত দোকানে কাগজের যে দাম স্থির হইয়াছে উহার মূল্য পুস্তক প্রকাশকদের ক্ষমতার বাহিরে। তবুও নিয়ন্ত্রিত দোকানে প্রায়ই কাগজ পাওয়া যায় না। চোরাবাজারে যা পাওয়া যায় তার মূল্য নিয়ন্ত্রিত দোকানের চাইতে ডবলেরও বেশি। কাগজকে সহজপ্রাপ্য ও স্বল্পমূল্য করিয়া দেশবাসীর মধ্যে বিতরণ সরকারের সবচাইতে বড় কাজ। কারণ কাগজের অভাবে আমাদের শিক্ষাকার্য প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

পাক-সরকারের আমলে কাগজের যে মূল্য ছিল বর্তমান সরকারের আমলে তাহার দাম দ্বিগুণ হইয়াছে। শুনিয়াছি আবগারী কর বাড়াইয়া দেওয়ার জন্যই কাগজের দাম নিয়ন্ত্রিত দোকানেও এত বাড়িয়াছে। দেশের অভ্যন্তরে কাগজ বিক্রি হইতে সরকার কত টাকাই বা আয় করেন? ৫০/৬০ লক্ষ টাকার বেশি বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এই সামান্য আয়ের জন্য যে দেশের শিক্ষাকার্য বৃথা হইতে চলিয়াছে। যে শিক্ষাকার্য সম্যক প্রসারের জন্য সরকার প্রতি বৎসরে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছেন, কাগজের দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্য তাহা বিফল হইয়া যাইতেছে। এ যেন গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালার মত।

কাগজের কথা আসিতেই দেশের মুদ্রণ ব্যবস্থার কথা আসিয়া পড়ে। খানসেনাদের ধ্বংসযজ্ঞের পর দেশে সীমিত সংখ্যক মুদ্রণযন্ত্র অবশিষ্ট আছে। সেখানে বইপুস্তক ছাপাইতে এখন পূর্বের চাইতে তিনগুণ টাকা খরচ করিতে হয়। পূর্বে এক ফর্মা ছাপাইতে যেখানে ৫০/৬০ টাকা লাগিত এখন লাগে দুইশত টাকা।

সেইজন্য আমাদের প্রকাশকরা কোন নতুন বই ছাপাইতে চাহেন না। পূর্বেকার ছাপানো বইপুস্তক লইয়াই তাঁহারা কোনরকমে দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছেন। এই পুরাতন স্টক ধীরে ধীরে নিঃশেষ হইয়া গেলে বইপুস্তকের দোকানে তালা পড়িবে। শুনিয়াছি মুদ্রণযন্ত্র চালাইয়া বহু প্রেস-মালিক ফুলিয়া-ফাঁপিয়া কলাগাছ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা টাকার তোড়া কোমরে বাঁধিয়া প্রেস কিনিতে বিদেশী মুদ্রার জন্য সরকারের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন। তাঁহারা যথারীতি প্রেস কিনিবার বিনিময় মুদ্রা পাইলে দেশে আরো নতুন নতুন মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হইবে এবং পরস্পরের প্রতিযোগিতায় বই-পুস্তকের মুদ্রণমূল্য যথেষ্ট কমিবে।

আশা করি আমাদের সরকার লালফিতার আর নিয়ম-কানুনের জটিলতা যথেষ্ট পরিমাণ কমাইয়া বিদেশ হইতে মুদ্রণযন্ত্র আনিবার সুযোগ করিয়া দিবেন। এদেশে বহুল প্রচারিত কোন মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা এখনও গড়িয়া ওঠে নাই। বইপুস্তকের বিজ্ঞাপনের একমাত্র বাহন সংবাদপত্রগুলি। তাহাতে বিজ্ঞাপন দিতে যে খরচ হয়, তাহা এত বেশি যে সেখানে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া কোন উপকার হয় না। তাছাড়া আলপনা রেখার মত একদিনেই এই বিজ্ঞাপন শেষ হইয়া যায়। মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকার মত কিছুদিন ধরিয়া পাঠকের চোখের সামনে সেই বিজ্ঞাপন ধরিয়া রাখে না। কিন্তু আমাদের বইপুস্তকের খবর যদি পাঠক সমাজের গোচরে আনিতে না পারা যায় তবে পাঠকেরা বইপুস্তক নির্বাচন করিবেন কি করিয়া?

দেশের সাহিত্য প্রচারে এইসব সমস্যার কথা বিবেচনা করিয়া ভূতপূর্ব প্রচারমন্ত্রী জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্র-পত্রিকাগুলিকে নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাঁহারা যেন বইপুস্তকের বিজ্ঞাপনের হার কমাইয়া শতকরা পঁচিশ ভাগ করেন।

সেই আদেশ সরকার নিয়ন্ত্রিত দু'একটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া বহুল প্রচারিত দৈনিক কাগজগুলি মানেন নাই, যদিও ইহারা পরোক্ষভাবে সরকার কর্তৃক পরিচালিত। ইহা মান্য করিলে তাহাদের কোন ক্ষতি হইত না। কারণ উচ্চহারের জন্য দৈনিক কাগজে বইপুস্তকের বিজ্ঞাপন কদাচিৎ বাহির হয়। নির্দিষ্ট সংখ্যক পৃষ্ঠায় তাঁহারা প্রতিদিন খবরের কাগজ বাহির করেন। খবরাখবর ও বিজ্ঞাপন ছাপাইয়াও দৈনিক কাগজগুলিতে কিছু কিছু স্থান খালি থাকে। সেইসব জায়গায় তাঁহারা বইপুস্তকের বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া একদিকে দেশের সৃজনধর্মী সাহিত্যিকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন অপরদিকে দেশের সাহিত্যের প্রচার করিয়া শিক্ষাকার্যকে সুদূরপ্রসারিত

করিবেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে আমাদের সংবাদপত্র মালিকেরা এদিকে দিয়া কোনই উদারতা দেখাইতে নারাজ। এমনকি সিনেমা নাটকের যে হ্রাসকৃত বিজ্ঞাপনের হার নির্দিষ্ট আছে বইপুস্তকের বিজ্ঞাপনে তাঁহারা উহাও লইতে নারাজ। বঙ্গবন্ধুর নিকট আমাদের আবেদন, তিনি যেন পত্র-পত্রিকায় বইপুস্তকের বিজ্ঞাপনের হার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ কমাইয়া দেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা নিবেদন করিব। পশ্চিমবঙ্গ হইতে আমরা প্রতি বৎসর ৬০/৭০ লাখ টাকা মূল্যের বইপুস্তক আনিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের লিখিত বইপুস্তক পশ্চিমবঙ্গে যাইতে পারে না। আমাদের এখানে যেমন কত টাকার বইপুস্তক আনিতে পারিব তাহার অঙ্ক নির্দিষ্ট আছে। আমার বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গে তেমন অঙ্ক চিহ্নিত নাই।

দান-প্রতিদান না থাকিলে সেই সখ্য বেশিদিন টিকে না। একমুখী পথে যাওয়া-আসা চলে না। এদেশের-ওদেশের ভালবাসার বন্ধন যাঁহারা আরো অন্তরঙ্গ করিতে চান তাঁহারা যেন এই কথাটি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখেন।

সাহিত্য জনজীবনের বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ লোকের আলেখ্য। পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী নদীর তীরে তীরে, এদেশের উদার গগনতলে, অবারিত মাঠের কোলে যাহারা ঘর-বসতি করিয়া জীবনের কাহিনী রচনা করে, আমাদের সাহিত্য তাহাদেরই কথায় ভরপুর। কি আমরা হইতে চাহিয়াছি, কি আমরা হইতে পারিয়াছি, কি আমরা হইতে পারি নাই – যুগে যুগে এই কাহিনীই শুধু আমাদের সাহিত্যকে রূপ দিয়াছে। তাহা না জানিলে ওদেশের বন্ধুরা যতই উদারমনা হউন, আমাদের কিছুই জানিতে পারিবেন না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা আসিয়া পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য নভেল নাটক কাব্যগ্রন্থ এখানকার কতকগুলি প্রকাশক হরিলুটের মত লেখকের প্রাপ্য পারিশ্রমিক ছাড়া অবাধে প্রকাশ করিয়া বিক্রি করিতেছে। গ্রন্থকারদিগকে উপযুক্ত রয়ালটি দিতে হয় না বলিয়া এই পুস্তকগুলি অল্প মূল্যে বিক্রি হয়। এই পুস্তকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশে প্রকাশিত বইপুস্তক দাঁড়াইতে পারে না। কারণ এখানে ছাপা খরচ ও কাগজের মূল্য অত্যধিক এবং লেখকদের পারিশ্রমিক দিতে হয় বলিয়া আমাদের বইপুস্তকের দাম বাড়াইতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বইগুলি বিনা রয়্যালটিতে ছাপাইবার সুযোগ পাইয়া সেইসব বইয়ের দাম যথারীতি কম রাখা হয়। এখানকার প্রকাশকেরা তাই দেশী লেখকদের বইপুস্তক ছাপাইতে চাহেন না। বইপুস্তকের পাণ্ডুলিপি হস্তে

লইয়া এদেশের লেখকেরা চোখের পানিতে বুক ভাসায়। এরূপ চলিতে দেওয়া আমাদের রাষ্ট্রের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। বিদেশের সাহিত্য ও জ্ঞানভাণ্ডারের পথ আমরা রুদ্ধ করিতে চাহি না। সাহিত্যকলা আবহমানকাল হইতে ভৌগোলিক, ধর্মনৈতিক, রাজনৈতিক মতবাদের বেড়া ডিঙ্গাইয়া চিরদিনই সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু আমাদের পায়ের তলার ভিত্তিভূমি উৎখাত করিয়া আমরা অপর দেশের সাহিত্যকলা হজম করিতে পারিব না।

এই ব্যাপারে এ দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে বিক্ষোভ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। আমরা ভারত এবং বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন এ বিষয়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করেন।

আমরা যখন সাহিত্য চর্চা আরম্ভ করিয়াছিলাম সেদিনেও সাহিতিকদের বহু গোষ্ঠী ছিল। কিন্তু সেইসব গোষ্ঠী মতামত বা বিশেষ রচনা-পদ্ধতি দ্বারা লেখকদের বিচার করিত না। লেখকদের বিচার হইত রস সৃষ্টিতে, তার নিজস্ব প্রকাশভঙ্গিতে। ভাল সৃষ্টিকার্য হইলে সকল দলের সাহিত্যিকই তাহা গ্রহণ করিতেন।

আজ দিন পাল্টাইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন মতবাদে আর রচনা পদ্ধতিতে বিভক্ত হইয়া সাহিত্য-ভারতী আজ খণ্ডবিখণ্ড। একদলের মতামতের সঙ্গে যে দলের মতামত মিলে না সেই দলকে তাহারা নস্যাৎ করিতে চায়। উহারা নিজ নিজ মতবাদের ফিতা লইয়া সাহিত্যের পরিমাপ করিতে চাহেন।

ইতিপূর্বে খানসেনাদের আমলে একদল বলিতেন, রাশিয়ায় যেমন আদর্শের পরিপন্থী কেহ কিছু লিখিলে তাহাকে কঠোর শাস্তির জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, আমাদের নতুন রাষ্ট্রের – ইত্যাদি ইত্যাদি।

অপর রাজনৈতিক মতবাদ-পুষ্ট সাহিত্যিক দলও আছে। সরস্বতী কমল-বনে মদমত্ত হস্তীযূথের মত ইহারা সুকোমল ফুলদলগুলিকে ফুটিয়া উঠিতে বিঘ্নের সৃষ্টি করিতেছে।

ইহা ছাড়া আছে আঙ্গিক-সর্বস্ব অতি আধুনিক কবির দল। দুই-চারজন ক্ষমতাবান লেখক ছাড়া ইহারা একে অপরের অনুকরণ করিয়া চলে। কলেরা-বসন্তের সংক্রামক রোগের মত, পশ্চিমের যুগ-যন্ত্রণার অসহ্য উল্লাসে ইহারা ক্ষত-বিক্ষত।

যুগোত্তর সাহিত্যস্রষ্টাদের সঙ্গে সঙ্গে বহু অনুকরণকারী সাহিত্যিকের উদয় হয়। রবীন্দ্রযুগেও হইয়াছিল। কিন্তু মহাকাল তাহাদিগকেও আবর্জনার মত ঝাপটাইয়া বিস্মৃতির অন্ধকারে ফেলিয়া দিয়াছে। আধুনিক কবিরা

কবিতা লইয়া যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতেছেন এজন্য আমি তাহাদের প্রশংসা করিতেছি, কিন্তু তাহারা যখন সদম্ভে উক্তি করেন, আমাদের রচনা পদ্ধতিই আজকের যুগের একমাত্র পথ। পূর্বসূরিদের রচনাশৈলী যাদুঘরের শামিল হইয়া থাকিবে।

ইহারা বলেন, মাইকেল যখন বিদেশ হইতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙলা ভাষার গলে পরাইয়া তাহার শোভা বর্ধন করিলেন তখন কেহ কেহ তাহার সমালোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ মাইকেলের রচনাশৈলী বাঙলা সাহিত্যে আলোকস্তম্ভের মত আপন প্রভায় দিকদিগন্ত উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে।

ইহাদের রচিত কাব্যও তেমনি বঙ্গ-সাহিত্যের আলোক-স্তম্ভ হইয়া বিরাজ করুক, এই কামনা করিতে পারিতাম; কিন্তু মাইকেলের কাব্য-শৈলী এ দেশের অতীত ঐতিহ্যের ভিত্তিপ্রস্তরের উপর দাঁড়াইয়া। তিনি যখনই সুযোগ পাইয়াছেন বাঙালির চিরাচরিত প্রথা, উপমা ও অলঙ্কার আনিয়া তাঁহার রচনার সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের বহু স্থানেই যে বাঙালিয়ানার ছাপ রহিয়াছে তাহা পাঠক জানেন। কাব্য শেষ হইয়াছে বাঙালি জীবনের চিরাচরিত একটি বিয়োগান্ত ঘটনার উপমা দিয়া।

'বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে। সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।'

অমিত্রাক্ষর ছন্দটিতেও যে মাইকেল এদেশের পয়ার ছন্দের মধ্যে ভরিয়া দিয়া তাহাতে গতি সঞ্চার করিয়াছেন, এ কথা কে না বিশ্বাস করেন? তবু দেশ-বিদেশ হইতে প্রকাশভঙ্গি আহরণ করিয়া নিজের রচনাকে সমৃদ্ধ করার রীতি আমরা সমর্থন করি। কিন্তু বিদেশী অনুকরণ আর অনুসরণই যে সাহিত্যের চরম এবং পরম প্রকাশ এ কথা মানি কি প্রকারে?

আধুনিক কবিদের গুরু টি.এস. ইলিয়ট সাহেব বলিয়াছেন, অনুকরণ করিয়া বড় সাহিত্য গড়িয়া ওঠে না। অনুকরণই যদি পাঠকের রস-পিপাসা মিটাইত তবে বিদেশী কবিদের ভাল ভাল লেখা অনুবাদ করিয়া দিলেই তো চলিত। কিন্তু এমন দেশ কোথায় আছে, যেখানে রস-পিপাসু পাঠকেরা শুধুমাত্র বিদেশী কবিতার অনুবাদ পড়িয়াই তৃষ্ণা মিটায়।

দেশের অতীত ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির উপর দাঁড়াইয়া যাঁহারা সাহিত্য রচনা করেন না তাঁহারা শূন্যের উপর ঘর বাঁধিয়া থাকেন।

দেশের অতীত সাহিত্যের বুনিয়াদের উপর সাহিত্য-শৈলী স্থাপন না করিলে নতুন সাহিত্য যে পাঠক সাধারণ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবে।

পাঠক-বর্জিত সাহিত্যকে ধরিয়া রাখিবে কাহারা? বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজের রচনার জন্য বিদেশীদের উৎসাহপূর্ণ পত্রাবলী বা সমালোচনা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা ত অপর দেশের সাহিত্যকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবেন না।

এই দলের সাহিত্যিকেরা প্রবন্ধ লিখিয়া বক্তৃতা করিয়া দেশের প্রচলিত রচনা সম্ভারের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইলিয়ট সাহেব তাহারও উত্তর দিয়াছেন। যদি দেশের অতীত সাহিত্যকীর্তির প্রতি পাঠকের অশ্রদ্ধা জাগাইতে তাহারা সমর্থ হন, দেশের অগণিত পাঠক সাধারণের রস-পিপাসা মিটাইতে আধুনিক লেখকরা কয়খানা বইপুস্তক তাহাদের হাতে দিতে পারিবেন?

প্রায়ই রেডিও, টেলিভিশন ও খবরের কাগজগুলিতে ইহাদের সদম্ভ উক্তি শোনা যায়। বর্তমানের কবি সৃষ্টি হইবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আর বাংলা একাডেমী বা এরূপ অপর কোন প্রতিষ্ঠানে। বুদ্ধির কোটরে আবদ্ধ করিয়া নিজ রচনা প্রকাশ করিতে না পারিলে আজকের লেখক অপাঙক্তেয়। স্বভাব-কবির স্থান এখন আর নাই। তবে কি গোবিন্দদাসের মত কবির কাব্যকে আমরা আর পড়িব না?

তাহারা দলে ভারি। যাহার সত্যিকার প্রতিভা আছে তাহারা নিজেদের সৃষ্টিকার্যের উপরই নির্ভর করে। দলের প্রতি নির্ভর করিয়া যাহারা চলে তাহারা দুর্বল।

জানি ইহাদের অস্তিত্ব সাময়িক। কিন্তু দলবদ্ধ হইয়া তাহারা কবিতা ক্ষেত্রে যে একদেশদর্শিতার বিস্তার করিয়া অপর ধরনের কবিদের পথ রুদ্ধ করিতেছেন তাহার কঠোর প্রতিবাদ না করিয়া পারিতেছি না। ইতিপূর্বে সাহিত্যক্ষেত্রে এদেশে যতগুলি পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রায় সবগুলিই ইহারা দখল করিয়া লইয়াছেন। ইহারা দলে ভারি বলিয়া কোন কোন প্রবীণ সাহিত্যিক সাহিত্যরস উপভোগ করিবার একবিন্দুও যাহাদের সামর্থ্য নাই, তাহারা মাঝে মাঝে আসিয়া ইহাদের পিঠ চাপড়াইয়া যান। প্রতিদানে ইহাদের নিকট হইতে কিছু শ্রদ্ধা-ভক্তিও পাইয়া থাকেন। কিন্তু নতুন দলের কবিরাও জানেন ইহাদের মধ্যে তিল পরিমাণও সাহিত্যবোধ নাই।

আমরা কাহারও পথ রোধ করিতে চাই না। আমরা ইহাও চাই সাহিত্যক্ষেত্রে কেহ যেন কোন সাহিত্যিকের পথ রুদ্ধ করিতে না পারে।

বিদেশ হইতে সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি, রচনারীতি আহরণ করিয়া ইহারা যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতেছেন তাহাতেও আমরা বাধা সৃষ্টি করিতে চাহি না। কারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে ইহাতে বাংলা সাহিত্যেরই পুষ্টিসাধন হইতেছে। আমরা শুধু এই কথাটিই বলিতে চাই ইহারা যেন আর কাহারও পথ রুদ্ধ করিতে না পারেন।

ধর্মমত লইয়া অথবা রাজনৈতিক আদর্শ লইয়া যাঁহারা সাহিত্য করেন তাঁহাদের পথও আমরা রুদ্ধ করিতে চাহি না। মওলানা রুমী, হাফেজ, সাদী ইহারাও লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্য। কিন্তু ইসলামের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া ইহাদের সাহিত্য আজ বিশ্বসাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। বৈষ্ণব পদকর্তারা রাধাকৃষ্ণের লীলা উপভোগ করিবার জন্যই সুললিত পদাবলী সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন। এই পদাবলী তাঁহারা আপন গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতেন।

বহিরঙ্গ লোক লয়ে করে নাম সংকীর্তন,
অন্তরঙ্গ লোক লয়ে করে রস আলাপন।

কিন্তু বৈষ্ণবের পানপাত্র গড়াইয়া এই রস-আলাপন আজ বিশ্বের রস-পিপাসুদের উপভোগের সামগ্রী হইয়াছে।

সাহিত্যকলা চিরকালই সার্বজনীনতার দিকে ধাওয়া করে।

বাংলাদেশে একটি প্রবাদ আছে :

চৈতন্য আনন্দময় –
যার মনে যা লয়।

বহুমতের, বহুপথের, বহু প্রকারের আলঙ্কারিতা আসিয়া বাংলা সাহিত্যকে উদ্ভাসিত করুক। এখানে যত মত তত পথ। আমার গৃহে সাহিত্য সাধনা সঙ্ঘ নামে একটি পাক্ষিক সাহিত্য সভা বসে। গত ২৫ বৎসর ধরিয়া সমানে আমরা ইহা চালাইতেছি। এখানে মতবাদের কোন বালাই নাই। নবীন-প্রবীণ সকল মতের সকল দলের সাহিত্যিকরাই এখানে আসেন। মাঝে মাঝে আধুনিক কবিরা আসিয়া আমাদের গালি দিয়া যান। উহাতে আমরা নতুন করিয়া নিজেদের সৃষ্টিকার্যের মূল্যায়ন করিতে পারি।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলাদেশে বইপুস্তক ও রচনা-কার্য প্রকাশের একমাত্র পথ খবরের কাগজের রবিবাসরীয় সাহিত্য বিভাগ, আর রেডিও এবং টেলিভিশন সংস্থা। দলে ভারি বলিয়া অতি আধুনিকেরা চাকুরি লইয়া বা নিজ মতবাদের প্রভাব বিস্তার করিয়া সাহিত্য প্রচারের এইসব বিভাগ দখল করিয়া লইয়াছেন। তাহাদের দলের বাহিরের কেহ বড় একটা এইসব স্থানে

প্রবেশ করিতে পারে না। অথচ এদেশের উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়া আর কোন প্রতিষ্ঠান নাই যেখান হইতে অন্য পথের সাহিত্যিকেরা দু'পয়সা উপার্জন করিতে পারে। সাহিত্যকলা শতদলে শোভিত। অপর দলগুলিকে দলিয়া পিষিয়া তার একটিমাত্র দলকে প্রস্ফুটিত হইবার সুযোগ দিলে সেই দলটিও সহজভাবে ফুটিতে পারে না। তাহার ফুটিয়া ওঠা কৃত্রিম হইয়া পড়ে।

মহাকালই সব সাহিত্যের যাচনদার। সেইজন্য মহাকালের বিচারের জন্যই অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম। কিন্তু দলবদ্ধ হইয়া ইহারা আর সাহিত্যিকের গলা টিপিয়া ধরিয়া প্রকাশের পথ রুদ্ধ করিয়াছেন। এই কথাগুলি দেশবাসীর সামনে তুলিয়া ধরিবার জন্যই এত কথার অবতারণা।

পূর্বেই বলিয়াছি দেশের কালচার কৃষ্টির প্রচারের বাহন দৈনিক সংবাদপত্র ছাড়া টেলিভিশন ও বেতারযন্ত্র।

টেলিভিশন হইতে দিনের পর দিন বিলাতী ফিল্মের যেসব নরহত্যা, লুণ্ঠন, রাহাজানি প্রভৃতি দেখান হয় তাহা আমাদের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারকম নাশকতামূলক কার্যকলাপের ইন্ধন যোগাইতেছে। মাঝে মাঝে এখান হইতে বিদেশী ইলেকট্রিক গীটার-যোগে যে বিকৃত পপসঙ্গীত প্রচারিত হয়, তাহা এদেশের রুচিকে কলঙ্কিত করিতেছে। এখান হইতে যেসব নাটক প্রচারিত হয় তাহা দেখিয়া মনে হয় আমরা যেন আমাদের দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া কোন নতুন দেশে আসিয়াছি। দোতারা, সারিন্দা, খোমক, বাঁশী, সেতার, এস্রাজ মুখরিত আনন্দ উচ্ছল সেই বাংলাদেশ আজ কোথায়? লালন, শানাল শা, দুখাই খন্দকারের অশ্রুজলে স্নাত সেই বাংলা কোথায়?

রেডিওযন্ত্রেও সেই একই ব্যাপার। বিদেশের অনুকরণে আধুনিক গানের আদর এখানে সবচাইতে বেশি। এত কথা আজ বলিতাম না। কিন্তু ট্রানজিস্টারের বদৌলতে রেডিওযন্ত্র আজ সুদূর গ্রাম অঞ্চলের কৃষাণ-কুটিরে, নদীনালায়, ধানক্ষেতে, পাটক্ষেতে প্রবেশ করিয়াছে। মেশিন এখানে কথা বলে এমন আশ্চর্য ঘটনা সাধারণ মানুষকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তাহারা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, মেশিন যাহা বলে তাহাই চরম এবং পরম। দেশের স্বতঃস্ফূর্ত যে লোক-সংস্কৃতির ধারা, যাহা আউল-বাউল ও সাঁই দরবেশ ও গায়কেরা নানা অভাব অনাচারের মধ্যে দুর্ভিক্ষে, অনাহারে, প্লাবনে, মহামারীতে, রাষ্ট্রবিপ্লবে হতাহত হইয়াও যক্ষের ধনের মত এতকাল বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, রেডিওযন্ত্রের একটি ফুৎকারে

তাহা নির্বাপিত হইতে চলিয়াছে। বিদেশের দুর্গন্ধময় নর্দমায় নিক্ষেপিত আধুনিক সুরকে কুড়াইয়া আনিয়া এখানে মহাসমারোহে প্রচার করিয়া দেশের শাশ্বতকালের কৃষ্টির উপর কুঠারাঘাত করিতেছে। কাঞ্চন ফেলিয়া এই কাঁচের বেসাতি আমরা আর কতকাল করিব?

আমার কথাগুলি শেষ হইবার আগে পূর্বের কথিত কথাগুলি আর একবার পুনরাবৃত্তি করিতে চাই।

সাহিত্যকে শতদলে বিকশিত হইবার সুযোগ দিতে :

১. কাগজের উপর হইতে আবগারী কর মওকুফ করিয়া কাগজকে সহজলভ্য করিতে হইবে।
২. পশ্চিমবঙ্গ হইতে বইপুস্তক আনিবার আগে ভারতের সঙ্গে চুক্তি করিতে হইবে তাহারাও যেন এখান হইতে সমমূল্যের বইপুস্তক ক্রয় করেন।
৩. বইপুস্তকের বিজ্ঞাপনের হার শতকরা ৭৫ ভাগ কমাইতে হইবে।
৪. দেশে অসংখ্য মুদ্রণযন্ত্র আনিবার জন্য উপযুক্ত বিদেশী মুদ্রা নির্দিষ্ট করিতে হইবে।
৫. রেডিও টেলিভিশন হইতে বিকৃত রুচির অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করিতে হইবে।
৬. সাহিত্যের উপর পুরস্কার দিতে কোন দলবিশেষের প্রভাব বাতিল করিতে হইবে। কিছু লেখক, কিছু বুদ্ধিজীবী, কিছু শিক্ষা বিভাগের সভ্য লইয়া কমিটি গঠন করিয়া পুরস্কারের যোগ্য সাহিত্যিক নির্বাচন করিতে হইবে।
৭. আয়করের হাত হইতে সাহিত্যিকদিগকে মুক্ত করিতে হইবে। যদিও এদেশের সাহিত্যিকগণ বইপুস্তক হইতে বিশেষ কিছু আয় করেন না, তবু আয়করের দরবারে হিসাবপত্র দাখিল করিতে লেখকদের পক্ষে বড়ই বিড়ম্বনা। হিসাবপত্র রাখিতে অপটু লেখকেরা আয়করের আওতার বাহিরে থাকিয়া যাহাতে নিজ নিজ রচনাকার্যে মনোনিবেশ করিতে পারেন এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। ইতিপূর্বে সরকার এ ব্যাপারে সামান্য কিছু করিয়াছিলেন, তাহাতে লেখকদের বিশেষ কোন উপকার হয় নাই।
৮. লেখকদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের পরিবার-পরিজন কপর্দকহীন নিঃস্ব হইয়া পড়ে। সেইজন্য লেখকদের লইয়া সরকার একটি জীবনবীমা গঠন করিবেন। মৃত্যুর পরে লেখকদের পরিবার সেখান হইতে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের ভাতা পাইবেন। বঙ্গবন্ধুর গঠিত লেখক ট্রাস্ট হইতে

এরূপ জীবনবীমার খরচ চালান যাইতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, ইতিপূর্বে সরকারের সব বিভাগে যৌথ জীবনবীমার ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে।
৯. এদেশে কোন রঙ্গমঞ্চ নাই। পাড়ার ছেলেরা চাঁদা তুলিয়া মাঝে মাঝে যে নাটক মঞ্চস্থ করে তাহাতে টিকেটের বন্দোবস্ত হইলে আবগারী বিভাগ প্রমোদকর আদায় করিতে আসেন। গ্রামদেশে যাত্রা, লোকসঙ্গীত প্রভৃতির অনুষ্ঠানে যদি টিকেটের ব্যবস্থা করা হয় তাহাতেও প্রমোদকর দিতে হয়। আমাদের প্রস্তাব সিনেমা হলগুলি বাদে দেশের অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সরকার যেন কোন প্রমোদকর আদায় না করেন।

আমার প্রস্তাব অনুসারে যদি সত্যি সত্যি কাজ করা হয় (আর এ কাজ সরকারের পক্ষে এবং লেখকদের পক্ষে খুবই সহজ) তবে বাংলাদেশে লেখকদের জন্য আর কোনরকম পুরস্কার ঘোষণা করার প্রয়োজন হইবে না। সাহিত্য ভাতা দিবারও আর দরকার হইবে না। আমাদের পাঠক সাধারণই বইপুস্তক বহুলভাবে ক্রয় করিয়া দেশের লেখকদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবেন। দিনে দিনে দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা যেমন বাড়িতেছে বইপুস্তকের চাহিদাও তেমনি বাড়িবে।

পশ্চিমবঙ্গে আমার কোন কোন সাহিত্যিক বন্ধু পূর্বে অভাবের তাড়নায় মাত্র পাঁচ টাকার জন্য পথে পথে ঘুরিতেন। সেখানে আজ তাঁহারাই গাড়ি বাড়ি করিয়া সচ্ছল জীবন যাপন করিতেছেন। লেখক হইলেই যে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হইবে এমন কথা এ যুগে চলে না। ইউরোপের কোন দেশেই আজ সাহিত্যিকেরা সরকারের গলগ্রহ নন। তাঁহাদের সচ্ছল জীবিকার পথ তাঁহাদের পাঠকেরাই করিয়া দিয়াছেন।

দেশের অসংখ্য মানুষের মর্মকথা যা তাঁহাদের চেতন এবং অবচেতন মন হইতে আহরণ করিয়া লেখকেরা সৃষ্টির ইন্দ্রজাল রচনা করেন তাহা রাজনৈতিক নেতারা জানেন না, সংবাদপত্রের ভাষ্যকারদেরও ধারণার অতীত। তা শুধু দেশের সাহিত্যিকেরাই জানিয়া নিজ নিজ লেখায় প্রতিফলিত করেন। তাহা হইতে দেশ গড়ার কারিগরের অনেক কিছু জানিয়া দেশকে সত্যকার পথে চলিতে সাহায্য করেন।

দেশের এই সাহিত্যিক গোষ্ঠীকে যদি বাঁচিয়া থাকিবার জন্য, নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সরকারের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় তবে তাঁহারা নিজ নিজ রচনায় সত্যভাষণ করিতে পারেন না। তাঁহাদের সাহিত্য কৃত্রিম হইয়া

পড়ে। কারণ লেখকের আন্তরিকতা না থাকিলে সৃষ্টিকার্য পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে না।

পক্ষান্তরে দেশে যদি একদল সৃষ্টিধর্মী মানুষ গড়িয়া ওঠে, যাঁহাদের জীবিকার পথ পাঠকেরাই করিয়া দেন, তাঁহারা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হইয়া যে সাহিত্য রচনা করেন তাহার প্রভাবে কোন স্বৈরাচারী সরকার বা যে কোন দাম্ভিক একদেশদর্শী ডিক্টেটর জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যাইবে। বিদেশের ইতিহাসে ইহার বহু বহু নজির রহিয়াছে। নাটকে নভেলে কবিতায় প্রবন্ধে এ পর্যন্ত আমরা যাহা করিয়াছি আজ তাহার মূল্যায়ন করিতে পারিব না। কিন্তু সাহিত্য করিয়া আমরা এদেশের সাড়ে সাত কোটি লোকের যাহারা পড়িতে পারে তাহাদের মন জয় করিয়াছি। আমাদের নভেল ঘরে ঘরে প্রবেশ করে, আমাদের নাটক দেখিতে দর্শকেরা ভিড় করিয়া আসে। আমাদের কবির লেখা কবিতা ঘরে ঘরে আবৃত্তি হয়। আমাদের পাঠক সংখ্যা সীমিত বলিয়া অন্য দেশের মত আমরা অর্থবান নই। আমরা যদি অন্য দেশে জন্মগ্রহণ করিতাম যেখানে বই-পুস্তকের অজস্র পাঠক, তবে আমরাও সে দেশের সাহিত্যিকদের মত অর্থবান হইতে পারিতাম। হয়তো সেই দেশের রুচিজ্ঞানের সঙ্গে মিলাইয়া আমাদের প্রকাশভঙ্গিমা ও বিষয়বস্তুর হয়তো কিছু পরিবর্তন করিতে হইত।

কবি, জারি, মুর্শীদা, বাউল, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি গ্রাম্য গানের কথায় এবং সুরে নানা রকমের প্রকাশভঙ্গিমা আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদের সামনে রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সঙ্গে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি, ঊনবিংশতি ও বিংশতি শতাব্দীর সাহিত্য সাধকদের প্রকাশ ধারা। পশ্চিমের সাহিত্য হইতে মাত্রাজ্ঞান, বাহুল্যবর্জন ভাবপ্রকাশে ইঙ্গিত প্রভৃতি শিখিয়া আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের সৃষ্টির বুনিয়াদের উপর নতুন করিয়া সাহিত্য-কর্মে মনোনিবেশ করিব। এই দেশে আরও মাইকেল জন্মিবে, আরও রবীন্দ্রনাথ, আরও মীর মশাররফ হোসেন জন্মিয়া এদেশকে গৌরব হইতে গৌরবের তোরণ দুয়ারে লইয়া যাইবে। জয় বাংলা ভাষা।

* ঐতিহাসিক ২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে বাংলা একাডেমী ১৯৭৪ সালের ১৪-২১শে ফেব্রুয়ারি ৮ দিনব্যাপী 'বাংলা সাহিত্য সম্মেলন' নামে একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করে। সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত এ সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন। সম্মেলনের উদ্বোধনী দিবসে তাঁর প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ।

সূত্র : জসীম উদ্‌দীন জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা ৫৭১-৫৮১।

রাখাল ছেলে

"রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে! বারেক ফিরে চাও,
বাঁকা গাঁয়ের পথটি বেয়ে কোথায় চলে যাও?"

"ওই যে দেখ নীল-নোয়ান সবুজ ঘেরা গাঁ,
কলার পাতা দোলায় চামর শিশির ধোয়ায় পা;
সেথায় আছে ছোট্ট কুটির সোনার পাতায় ছাওয়া,
সাঁঝ-আকাশের ছড়িয়ে-পড়া আবীর-রঙে নাওয়া;
সেই ঘরেতে একলা বসে ডাকছে আমার মা –
সেথায় যাব, ও ভাই এবার আমায় ছাড় না!"

"রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে! আবার কোথা ধাও,
পূব আকাশে ছাড়ল সবে রঙিন মেঘের নাও।"

"ঘুম হতে আজ জেগেই দেখি শিশির-ঝরা ঘাসে,
সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে।
আমার সাথে করতে খেলা প্রভাত হাওয়া, ভাই,
সরষে ফুলের পাঁপড়ি নাড়ি ডাকছে মোরে তাই।
চলতে পথে মটরশুঁটি জড়িয়ে দুখান পা,
বলছে ডেকে, 'গাঁয়ের রাখাল একটু খেলে যা!'
সারা মাঠের ডাক এসেছে, খেলতে হবে ভাই!
সাঁঝের বেলা কইব কথা এখন তবে যাই।"

"রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে! সারাটা দিন খেলা,
এযে বড় বাড়াবাড়ি, কাজ আছে যে মেলা।"

কাজের কথা জানিনে ভাই, লাঙল দিয়ে খেলি
নিড়িয়ে দেই ধানের ক্ষেতের সবুজ রঙের চেলী।
সরষে বালা নুইয়ে গলা হল্‌দে হাওয়ার সুখে
মটর বোনের ঘোমটা খুলে চুম দিয়ে যায় মুখে!

ঝাউয়ের ঝাড়ে বাজায় বাঁশী পউষ-পাগল বুড়ী,
আমরা সেথা চষতে লাঙল মুর্শীদা-গান জুড়ি।
খেলা মোদের গান গাওয়া ভাই, খেলা লাঙল-চষা,
সারাটা দিন খেলতে জানি, জানিই নেক বসা।"

রাখালী (১৯২৭)

কবর

এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম-গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।
এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা
সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা।
সোনালি ঊষায় সোনামুখ তার আমার নয়নে ভরি
লাঙল লইয়া খেতে ছুটিলাম গাঁয়ের ও-পথ ধরি।
যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত
এ কথা লইয়া ভাবি-সাব মোরে তামাসা করিত শত।

এমনি করিয়া জানি না কখন জীবনের সাথে মিশে
ছোট-খাট তার হাসি ব্যথা মাঝে হারা হয়ে গেনু দিশে।
বাপের বাড়িতে যাইবার কাল কহিত ধরিয়া পা
"আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু উজান-তলীর গাঁ।
শাপলার হাটে তরমুজ বেচি ছপয়সা করি দেড়ী,
পুঁতির মালার একছড়া নিতে কখনও হত না দেরী।
দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে,
সন্ধ্যা বেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুরবাড়ির বাটে!
হেস না – হেস না – শোন দাদু, সেই তামাক মাজন পেয়ে,
দাদি যে তোমার কত খুশি হত দেখিতিস যদি চেয়ে!
নথ নেড়ে নেড়ে কহিত হাসিয়া, "এতদিন পরে এলে,
পথ পানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখিজলে।"
আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়,
কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝ্‌ঝুম নিরালায়!
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ্ দাদু, "আয় খোদা! দয়াময়
আমার দাদীর তরেতে যেনগো ভেস্ত নাজেল হয়।"

তারপর এই শূন্য জীবনে যত কাটিয়াছি পাড়ি
যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।
শত কাফনের, শত কবরের অঙ্ক হৃদয়ে আঁকি,
গণিয়া গণিয়া ভুল করে গণি সারা দিনরাত জাগি।
এই মোর হাতে কোদাল ধরিয়া কঠিন মাটির তলে,
গাড়িয়া দিয়াছি কত সোনামুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে।
মাটিরে আমি যে বড় ভালবাসি, মাটিতে মিশায়ে বুক,
আয় – আয় দাদু, গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ।

এইখানে তোর বাপজি ঘুমায়, এইখানে তোর মা,
কাঁদছিস্ তুই? কি করিব দাদু! পরাণ যে মানে না।
সেই ফালগুনে বাপ তোর এসে কহিল আমারে ডাকি,
বা-জান, আমার শরীর আজিকে কি যে করে থাকি থাকি।"
ঘরের মেঝেতে সপ্‌টি বিছায়ে কহিলাম, বাছা শোও,
সেই শোওয়া তার শেষ শোওয়া হবে তাহা কি জানিত কেউ?
গোরের কাফনে সাজায়ে তাহারে চলিলাম যবে বয়ে,
তুমি যে কহিলা, "বা-জানরে মোর কোথা যাও দাদু লয়ে?"
তোমার কথার উত্তর দিতে কথা থেমে গেল মুখে,
সারা দুনিয়ার যত ভাষা আছে কেঁদে ফিরে গেল দুখে।
তোমার বাপের লাঙল-জোয়াল দুহাতে জড়ায়ে ধরি,
তোমার মায়ে যে কতই কাঁদিত সারা দিনমান ভরি।
গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝরে,
ফাল্‌গুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শুনো – মাঠখানি ভরে।
পথ দিয়া যেতে গেঁয়ো পথিকেরা মুছিয়া যাইত চোখ,
চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত গাছের পাতার শোক।
আথালে দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠ পানে চাহি,
হাম্বা রবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জলে নাহি।
গলাটি তাদের জড়ায়ে ধরিয়া কাঁদিত তোমার মা,
চোখের জলের গহীন সায়রে ডুবায়ে সকল গা।

উদাসিনী সেই পল্লী-বালার নয়নের জল বুঝি,
কবর দেশের আন্ধার ঘরে পথ পেয়েছিল খুঁজি।
তাই জীবনের প্রথম বেলায় ডাকিয়া আনিল সাঁঝ,
হায় অভাগিনী আপনি পরিল মরণ-বিষের তাজ।
মরিবার কালে তোরে কাছে ডেকে কহিল, "বাছারে, যাই,
বড় ব্যথা রোল, দুনিয়াতে তোর মা বলিতে কেহ নাই;
দুলাল আমার, যাদুরে আমার, লক্ষ্মী আমার ওরে,
কত ব্যথা মোর আমি জানি বাছা, ছাড়িয়া যাইতে তোরে।"
ফোঁটায় ফোঁটায় দুইটি গণ্ড ভিজায়ে নয়ন-জলে,
কী জানি আশিস করে গেল তোরে মরণ-ব্যথার ছলে।

ক্ষণপরে মোরে ডাকিয়া কহিল, – "আমার কবর গায়
স্বামীর মাথার 'মাথাল' খানিরে ঝুলাইয়া দিও বায়।"
সেই যে মাথাল পচিয়া গলিয়া মিশেছে মাটির সনে,
পরাণের ব্যথা মরে নাক সে যে কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
জোড়মানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরু-ছায়,
গাছের শাখারা স্নেহের মায়ায় লুটায়ে পড়েছে গায়।
জোনাকী মেয়েরা সারারাত জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো,
ঝিঁঝিঁরা বাজায় ঘুমের নূপুর কত যেন বেসে ভোলো।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ্ দাদু, "রহমান খোদা! আয়;
ভেস্ত নাজেল করিও আজিকে আমার বাপ ও মায়!"

এইখানে তোর বু-জীর কবর, পরীর মতন মেয়ে,
বিয়ে দিয়েছিনু কাজীদের বাড়ী বনিয়াদী ঘর পেয়ে।
এত আদরের বু-জীরে তাহারা ভালবাসিত না মোটে,
হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে।
খবরের পর খবর পাঠাত, "দাদু যেন কাল এসে
দুদিনের তরে নিয়ে যায় মোরে বাপের বাড়ীর দেশে।"
শ্বশুর তাহার কসাই চামার, চাহে কি ছাড়িয়া দিতে,
অনেক কহিয়া সেবার তাহারে আনিলাম এক শীতে।

সেই সোনামুখ মলিন হয়েছে, ফোটে না সেথায় হাসি,
কালো দুটি চোখে রহিয়া রহিয়া অশ্রু উঠিছে ভাসি।
বাপের মায়ের কবরে বসিয়া কাঁদিয়া কাটাত দিন,
কে জানিত হায়, তাহারও পরাণে বাজিবে মরণ-বীণ।
কে জানি পচানো জ্বরেতে ধরিল আর উঠিল না ফিরে,
এইখানে তারে কবর দিয়েছি দেখে যাও দাদু! ধীরে।

ব্যথাতুরা সেই হতভাগিনীরে বাসে নাই কেহ ভালো,
কবরে তাহার জড়ায়ে রয়েছে বুনো ঘাসগুলি কালো।
বনের ঘুঘুরা উহু উহু করি কেঁদে মরে রাতদিন,
পাতায় পাতায় কেঁপে উঠে যেন তারি বেদনার বীণ।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ্ দাদু! "আয় খোদা দয়াময়!
আমার বু-জীর তরেতে যেন গো ভেস্ত নাজেল হয়।"

*　　*　　*

হেথায় ঘুমায় তোর ছোট ফুপু, সাত বছরের মেয়ে,
রামধনু বুঝি নেমে এসেছিল ভেস্তের দ্বার বেয়ে।
ছোট বয়সেই মায়েরে হারায়ে কি জানি ভাবিত সদা,
অতটুকু বুকে লুকাইয়াছিল কে জানিত কত ব্যথা!
ফুলের মতন মুখখানি তার দেখিতাম যবে চেয়ে,
তোমার দাদীর ছবিখানি মোর হৃদয়ে উঠিত ছেয়ে।
বুকেতে তাহারে জড়ায়ে ধরিয়া কেঁদে হইতাম সারা,
রঙিন সাঁঝেরে ধুয়ে মুছে দিত মোদের চোখের ধারা।

একদিন গেনু গজনার হাটে তাহারে রাখিয়া ঘরে,
ফিরে এসে দেখি সোনার প্রতিমা লুটায় পথের পরে।
সেই সোনামুখ গোলগাল হাত, সকলি তেমন আছে।
কি জানি সাপের দংশন পেয়ে মা আমার চলে গ্যাছে।
আপন হস্তে সোনার প্রতিমা কবরে দিলাম গাড়ি,
দাদু! ধর – ধর – বুক ফেটে যায়, আর বুঝি নাহি পারি।

এইখানে এই কবরের পাশে আরও কাছে আয় দাদু
কথা কস নাক, জাগিয়া উঠিবে ঘুম – ভোলা মোর যাদু।
আস্তে আস্তে খুঁড়ে দেখ দেখি কঠিন মাটির তলে,
দীনদুনিয়ার ভেস্ত আমার ঘুমায় কিসের ছলে !

* * *

ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিয়ে ঘন আবীরের রাগে,
অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে!
মজীদ হইতে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর
মোর জীবনের রোজকেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর।
জোড়হাত দাদু মোনাজাত কর, "আয় খোদা! রহমান।
ভেস্ত নাজেল করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত-প্রাণ!"

রাখালী (১৯২৭)

পল্লী জননী

রাত থম্ থম্ স্তব্ধ নিঝুম, ঘোর – ঘোর – আন্ধার,
নিশ্বাস ফেলি, তাও শোনা যায়, নাই কোথা সাড়া কার।
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা,
করুণ চাহনি ঘুম্ ঘুম্ যেন ঢুলিছে চোখের পাতা।
শিয়রের কাছে নিবু নিবু দীপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলে,
তারি সাথে সাথে বিরহী মায়ের একেলা পরাণ দোলে।

ভন্ ভন্ ভন্ জমাট বেঁধেছে বুনো মশকের গান,
এঁদো ডোবা হতে বহিছে কঠোর পচান পাতার ঘ্রাণ।
ছোট কুঁড়ে ঘর বেড়ার ফাঁকেতে আসিছে শীতের বায়ু
শিয়রে বসিয়া মনে মনে মাতা গণিছে ছেলের আয়ু।

ছেলে কয়, "মারে কত রাত আছে কখন সকাল হবে,
ভাল যে লাগে না, এমনি করিয়া কেবা শুয়ে থাকে কবে?"
মা কয়, "বাছারে! চুপটি করিয়া ঘুমাত একটি বার।"
ছেলে রেগে কয়, "ঘুম যে আসে না কি করিব আমি তার?"
পাণ্ডুর গালে চুমো খায় মাতা, সারা গায়ে দেয় হাত,
পারে যদি বুকে যত স্নেহ আছে ঢেলে দেয় তারি সাথ।
শামাজের ঘরে মোমবাতি মানে, দরগায় মানে দান,
ছেলেরে তাহার ভাল কোরে দাও, কাঁদে জননীর প্রাণ।
ভাল কোরে দাও আল্লা রছুল! ভাল কোরে দাও পীর!
কহিতে কহিতে মুখখানি ভাসে বহিয়া নয়ন নীর।
বাঁশবনে বসি ডাকে কানা কুয়ো, রাতের আঁধার ঠেলি,
দাদুড় পাখার বাতাসেতে পড়ে সুপারীর বন হেলি।
ছলে ঘুলোপথে জোনাকী মেয়েরা কুয়াশা কাফন ধরি,
দূর ছাই! কিবা শঙ্কায় মার পরাণ উঠিছে ভরি।
যে কথা ভাবিতে পরাণ শিহরে তাই ভাসে হিয়া কোণে,
বালাই, বালাই, ভালো হবে যাদু মনে মনে জাল বোনে।
ছেলে কয়, "মাগো! পায়ে পড়ি বলো, ভাল যদি হই কাল,
করিমের সাথে খেলিবারে গেলে দিবে নাত তুমি গাল?
আচ্ছা মা বলো, এমন হয় না রহিম চাচার ঝাড়া,
এখনি আমারে এত রোগ হোতে করিতে পারে ত খাড়া?"

মা কেবল বসি রুগ্ন ছেলের মুখ পানে আঁখি মেলে,
ভাসা ভাসা তার যত কথা যেন সারা প্রাণ দিয়ে গেলে।
"শোন মা, আমার লাটাই কিন্তু রাখিও যতন করে,
রাখিও ট্যাপের মোয়া বেঁধে তুমি সাত-নরি শিকা ভরে।
খেজুরে গুড়ের নয়া পাটালিতে হুড়ুমের কোলা ভরে,
ফুলঝুরি সিকা সাজাইয়া রেখো আমার সমুখ পরে।"
ছেলে চুপ করে, মাও ধীরে ধীরে মাথায় বুলায় হাত,
বাহিরেতে নাচে জোনাকী আলোয় থম থম কাল রাত।
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া কত কথা পড়ে মনে,
কোন দিন সে যে মায়েরে না বলে গিয়াছিল দূর বনে।
সাঁঝ হোয়ে গেল তবু আসে নাকো, আই-ঢাই মার প্রাণ,
হঠাৎ শুনিল আসিতেছে ছেলে হর্ষে করিয়া গান।
এক কোঁচ ভরা বেথুল তাহার ঝামুর ঝুমুর বাজে,
ওরে মুখপোড়া, কোথা গিয়াছিলি এমনি এ কালি সাঁঝে?
কত কথা আজ মনে পড়ে মার, গরীবের ঘর তার,
ছোট খাট কত বায়না ছেলের পারে নাই মিটাবার।
আড়ঙের দিনে পুতুল কিনিতে পয়সা জোটেনি তাই,
বলেছে, আমরা মুসলমানের আড়ঙ দেখিতে নাই।
করিম যে গেল? আজিজ চলিল? এমনি প্রশ্ন-মালা:
উত্তর দিতে দুখিনী মায়ের দ্বিগুণ বাড়িত জ্বালা।
আজও রোগে তার পথ্য জোটেনি, ওষুধ হয়নি আনা,
ঝড়ে কাঁপে যেন নীড়ের পাখিটি জড়ায়ে মায়ের ডানা।

ঘরের চালেতে ভূতুম ডাকিছে, অকল্যাণ এ সুর,
মরণের দূত এল বুঝি হায়! হাঁকে মায়, দূর – দূর।
পচা ডোবা হতে বিরহিনী ডা'ক ডাকিতেছে ঝুরি ঝুরি,
কিষাণ ছেলেরা কাল্‌কে তাহার বাচ্চা করেছে চুরি।
ফিরে ভন্ ভন্ মশা দলে দলে, বুড়ো পাতা ঝরে বনে,
ফাঁটায় ফোঁটায় পাতা-চোঁয়া জল ঝরিছে তাহার সনে।
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা
সম্মুখে তার ঘোর কুঞ্জটি মহা কাল-রাত পাতা।
পার্শ্বে জ্বলিয়া মাটির প্রদীপ বাতাসে জমায় খেল,
আঁধারের সাথে যুঝিয়া তাহার ফুরায়ে এসেছে তেল।

রাখালী (১৯২৭)

নিমন্ত্রণ

তুমি যাবে ভাই – যাবে মোর সাথে, আমাদের ছোট গাঁয়
গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায়
মাখা মমতায় জড়াজড়ি করি
মোর দেহখানি রহিয়াছে ভরি,
মায়ের বুকেতে, বোনের আদরে, ভাইয়ের স্নেহের ছায়,
তুমি যাবে ভাই – যাবে মোর সাথে, আমাদের ছোট গাঁয়।

ছোট গাঁওখানি – ছোট নদী চলে, তারি একপাশ দিয়া,
কালো জল তার মাজিয়াছে কেবা কাকের চক্ষু নিয়া;
ঘাটের কিনারে আছে বাঁধা তরী
পালের খবর টানাটানি করি;
বিনাসুতি মালা গাঁথিছে নিতুই এপার ওপার দিয়া;
বাঁকা ফাঁদ পেতে টানিয়া আনিছে দুইটি তটের হিয়া।

আমার বাড়ি

আমার বাড়ি যাইও ভোমর,
বসতে দেব পিঁড়ে,
জলপান যে করতে দেব
শালি ধানের চিঁড়ে।
শালি ধানের চিঁড়ে দেব,
বিন্নি ধানের খই,
বাড়ীর গাছের শবরী কলা,
গামছা-বাঁধা দই।
আম-কাঁঠালের বনের ধারে
শুয়ো আঁচল পাতি,
গাছের শাখা দুলিয়ে বাতাস
করব সারা রাতি।
চাঁদমুখে তোর চাঁদের চুমো
মাখিয়ে দেব সুখে,
তারা ফুলের মালা গাঁথি'
জড়িয়ে দেব বুকে।
গাই দোহনের শব্দ শুনি
জেগো সকাল বেলা,
সারাটা দিন তোমায় লয়ে
করব আমি খেলা।
আমার বাড়ী ডালিম গাছে
ডালিম ফুলের হাসি,
কাজলা দীঘির কাজল জলে
হাঁসগুলি যায় ভাসি।
আমার বাড়ি যাইও ভোমর,
এই বরাবর পথ,
মৌরী ফুলের গন্ধ শুঁকে
থামিও তব রথ।

হাসু (১৯৩৮)

মামার বাড়ি

আয় ছেলেরা, আয় মেয়েরা,
ফুল তুলতে যাই,
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
মামার বাড়ী যাই।
মামার বাড়ী পুণ্যিপুকুর
গলায় গলায় জল,
এপার হ'তে ওপার গিয়ে
নাচে ঢেউএর দল।
দিনে সেথা ঘুমিয়ে থাকে
লাল শালুকের ফুল,
রাতের বেলা চাঁদের সনে
হেসে না পায় কূল।
আম-কাঁঠালের বনের ধারে
মামা-বাড়ীর ঘর,
আকাশ হতে জ্যোছ্না-কুসুম
ঝরে মাথার পর।

রাতের বেলা জোনাক জ্বলে
বাঁশ-বাগানের ছায়,
শিমুল গাছের শাখায় বসে
ভোরের পাখী গায়।

ঝড়ের দিনে মামার দেশে
আম কুড়োতে সুখ,
পাকা জামের শাখায় উঠি
রঙীন করি মুখ।

কাঁদি-ভরা খেজুর গাছে
পাকা খেজুর দোলে,
ছেলে মেয়ে আয় ছুটে যাই
মামার দেশে চলে।

হাসু (১৯৩৮)

এ লেডি উইথ এ ল্যাম্প

গভীর রাতের কালে,
কুহেলি আঁধার মূর্ছিতপ্রায় জড়ায়ে ঘুমের জালে।
হাসপাতালের নিবিয়াছে বাতি; দমকা হাওয়ার ঘায়,
শত মুমূর্ষু রোগীর কাঁদন শিহরিছে বেদনায়।
কে তুমি চলেছ সাবধান পদে বয়স-বৃদ্ধা-নারী!
দুই পাশে তব রুগ্‌ণ-ক্লিন্ন শুয়ে আছে সারি সারি।
কাহার পাখাটি জোরে চলিতেছে, বালিশ সরেছে কার,
বৃষ্টির হাওয়া লেগে কার গায়ে শিয়রে খুলিয়া দ্বার!
ব্যাণ্ডেজ কার খুলিয়া গিয়াছে, কাহার চাই যে জল,
স্বপন দেখিয়া কেঁদে ওঠে কেবা, আঁখি দুটি ছল ছল।
এসব খবর লইতে লইতে চলিয়াছ একাকিনী,
দুঃখের কোন সান্ত্বনা তুমি, বেদনায় বিষাদিনী।

গভীর নিশীথে, অনেক উর্ধ্বে জ্বলিছে আকাশে তারা,
তোমার এ স্নেহ-মমতার কাজ দেখিতে পাবে না তারা;
রাত-জাগা পাখি উড়িছে আকাশে, জানিবে না সন্ধান,
রাত-জাগা ফুল ব্যস্ত বড়োই বাতাসে মিশাতে ঘ্রাণ।
তারা কেহ আজ জানিতে পাবে না, তাহাদেরি মত কেহ,
সারা নিশি জাগি বিলাইছে তার মায়েলী বুকের স্নেহ।
এই বিভাবরী বড়োই ক্লান্ত, বড়োই স্তব্ধতম,
উতলা বাতাস জড়াইয়া কাঁদে আঁধিয়ার নির্মম।
মৃত্যু চলেছে এলায়িত কেশে ভয়াল বদন ঢাকি,
পরখ করিয়া কারে নিয়ে যাবে, কারে সে যাইবে রাখি।
মহামরণের প্রতীক্ষাতুর রোগীদের মাঝখানে,
মহীয়সী তুমি জননী মূরতি আসিলে কি সন্ধানে;
জীবন-মৃত্যু মহা-রহস্য তুমি কি যাইবে খুলি,
ধরণীর কোন গোপন কুহেলি আজিকে লইবে তুলি।
যে বৃদ্ধ-কাল সাক্ষ্য হইয়া আছে মানুষের সাথে,
তুমি কি তাহার বৃদ্ধা সাথিনী আসিয়াছ আজ রাতে?

নিখিল নরের আদিম জননী আজিকে তোমার বেশে,
রুগ্‌ণ তাহার সন্তানদেরে দেখিয়া নিতেছ এসে।
নিরালা আমার শয্যার পাশে তোমার আঁচল-ছায়,
স্তব হয়ে আজ জড়ায়ে রহিতে বড় মোর সাধ যায়!

মাটির কান্না (১৯৫১)

নিবেদন

বিশ্ববাসীরা শোন,
মোদের কাহিনী শুনিয়া কাঁদিবে নাই কি দরদী কোন?
সীমান্ত পার হয়ে যারা গেছে হয়ত বেঁচেছে সবে,
এখানে যাহারা রয়েছি জানিনে কিবা পরিণাম হবে।
প্রতিদিন শুনি ভীষণ হইতে খবর ভীষণতর,
শিহরিয়া উঠি থাপড়াই বুক জীয়ন্তে মরমর,
রাত দিনের দু-খানি পাখায় লিখি অসহ্য গাথা,
চোখের সামনে দোলায় দেশের নিঠুর শাসন-দাতা।

পদ্মা মেঘনা যমুনা রূপালী রেখার মাঝে,
আঁকা ছিল ছবি সোনার বাঙলা নানা ফসলের সাজে।
সবুজ রেখার বিচিত্র ছবি, দেখে না মিটিত আশ,
ঋতুরা তাহারে নব নব রূপে সাজাইত বার মাস।

সে বাঙলা আজি বক্ষে ধরিয়া দগ্ধ গ্রামের মালা,
দহিয়া দহিয়া শিহরিয়া উঠে উগারি আগুন জ্বালা।
দস্যু সেনারা মারণ-অস্ত্রে বধি ছেলেদের তার,
সোনার বাঙলা বিস্তৃত এক শ্মশান কবরাগার।
বনে জঙ্গলে লুণ্ঠিত গৃহে কাঁদে শত নারী-নর,
কোথায় যাইয়া মিলিবে তাদের পুন আশ্রয়-ঘর!
দাবানল চেয়ে – মারিভয় চেয়ে শতগুণ ভয়াবহ,
নরঘাতীদের লেলিয়ে দিতেছে ইয়াহিয়া অহরহ।
প্রতিদিন এরা নরহত্যার যে কাহিনী এঁকে যায়,
হিরোশিমা নাগিরা যা দেখে শিহরিত লজ্জায়।

আজিও যাহারা বাঁচিয়া রয়েছি, আছি এই আশ্বাসে,
মানব ধর্মী ভাইয়া আসিয়া দাঁড়াবে কখনো পাশে।
তোমাদের কোলে আছে ছেলেমেয়ে, শপথ তাদের লাগে,
স্বামী-পুত লয়ে সুখ-গৃহ মাঝে আছ যারা অনুরাগে;
দেশ-দেশান্তে দয়া ধর্মের শপথ মানবতার,
তোমরা আসিয়া ভাঙ এ নিঠুর এজিদের কারাগার।
প্রতি মুহূর্তে শিশু মার কোলে মরিছে বুলেট ঘায়,
প্রতি মুহূর্তে শত অসহায় দলিত দস্যু পায়।
তাদের দীর্ঘ নিশ্বাসে ভরি উড়ানু পত্রখানি,
এই আশা লয়ে তোমাদের থেকে পাব আশ্বাস-বাণী।

ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে (১৯৭২)

মুক্তিযোদ্ধা

আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, মৃত্যু পিছনে আগে,
ভয়াল বিশাল নখর মেলিয়া দিবস রজনী আগে।
কখনো সে ধরে রেজাকার বেশ, কখনো সে খানসেনা,
কখনো সে ধরে ধর্ম লেবাস পশ্চিম হতে কেনা।
কখনো সে পশি ঢাকা-বেতারের সংরক্ষিত ঘরে,
ক্ষেপা কুকুরের মরণ কামড় হানিছে ক্ষিপ্ত স্বরে।
আমি চলিয়াছি চির-নির্ভীক অবহেলি সবকিছু,
নরমুণ্ডের ঢেলা ছড়াইয়া পশ্চাতপথ পিছু।
ভাঙ্গিতেছি স্কুল ভাঙ্গিতেছি সেতু স্টিমার জাহাজ লরি,
খান সৈন্যরা যেই পথে যায় আমি সে পথের অরি।
ওরা ভাড়া করা ঘৃণ্য গোলাম স্বার্থ-অন্ধ সব,
মিথ্যার কাছে বিকাতে এসেছে স্বদেশের বৈভব।

আমরা চলেছি রক্ষা করিতে মা-বোনের ইজ্জত,
শত শহিদের লোহুতে জ্বালানো আমাদের হিম্মত।
ভয়াল বিশাল আঁধার রাত্রে ঘন-অরণ্য ছায়,
লুণ্ঠিত আর দগ্ধ-গ্রামের অনল সমুখে ধায়।
তাহারি আলোতে চলিয়াছি পথ, মৃত্যুর তরবার,
হস্তে ধরিয়া কাটিয়া চলেছি খান-সেনা অনিবার।

এ'সোনার দেশে যতদিন রবে একটিও খান-সেনা,
ততদিন তক মোদের যাত্রা মুহূর্তে থামিবে না।
মাঠগুলি পুনঃ ফসলে ফসলে পরিবে রঙিন বেশ,
লক্ষ্মীর ঝাঁপি গড়ায়ে ছড়ায়ে ভরিবে সকল দেশ।
মায়ের ছেলেরা হবে নির্ভয়, সুখহাসি ভরা ঘরে,
দস্যু বিহীন এদেশ আবার শোভিবে সুষমা ভরে।

ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে (১৯৭২)

ধামরাই রথ

ধামরাই রথ, কোন অতীতের বৃদ্ধ সূত্রধর,
কতকাল ধরে গড়েছিল এরে করি অতি মনোহর।
সূক্ষ্ম হাতের বাটালি ধরিয়া কঠিন কাঠেরে কাটি,
কত পরী আর লতাপাতা ফুল গড়েছিল পরিপাটি।
রথের সামনে যুগল অশ্ব, সেই কত কাল হতে,
ছুটিয়া চলেছে আজিও তাহারা আসে নাই কোনোমতে।

তারপর এল নিপুণ পটুয়া, সূক্ষ্ম তুলির ঘায়,
স্বর্গ হতে কত দেবদেবী আনিয়া রথের গায়;
রঙের রেখার মায়ায় বাঁধিয়া চির জনমের তরে,
মহা সান্ত্বনা গড়িয়া রেখেছে ভঙ্গুর ধরা পরে।

কৃষ্ণ চলেছে মথুরার পথে, গোপীরা রথের তলে,
পড়িয়া কহিছে, যেও না বন্ধু মোদের ছাড়িয়া চলে।
অভাগিনী রাধা, আহা তার ব্যথা যুগ যুগ পার হয়ে,
অঝোরে ঝরিছে গ্রাম্য পোটোর কয়েকটি রেখা লয়ে।

সীতারে হরিয়া নেছে দশানন, নারীর নির্যাতন
সারা দেশ ভরি হৃদয়ে হৃদয়ে জ্বালায়েছে হুতাশন।
রাম-লক্ষ্মণ সুগ্রীব আর নর বানরের দল,
দশমুণ্ড সে রাবণে বধিয়া বহালো লহুর ঢল।

বস্ত্রহরণে দ্রৌপদী কাঁদে, এ অপমানের দাদ,
লইবারে সাজে দেশে দেশে বীর করিয়া ভীষণ নাদ।
কত বীর দিল আত্ম-আহুতি, ভগ্ন শঙ্খ শাঁখা
বোঝায় বোঝায় পড়িয়া কত যে নারীর বিলাপ মাখা।
শ্মশানঘাটা যে রহিয়া রহিয়া মায়েদের ক্রন্দন,
শিখায় শিখায় জ্বলিছে নিবিছে নব নব ইন্ধনে।

একদল মরে, আর দল পড়ে ঝাঁপায়ে শত্রুমাঝে,
আকাশ ধরণী সাজিল সে-দিন রক্তাম্বর সাজে।
তারপর সেই দুর্যোধনেরে সবংশে নিধনিয়া,
ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত যে হলো সারা দেশ নিয়া।
এই ছবিগুলি রথের কাঠের লীলায়িত রেখা হতে,
কালে কালে তাহা রূপায়িত হতো জীবনদানের ব্রতে।
নারীরা জানিত, এমনি ছেলেরা সাজিবে যুদ্ধ সাজে,
নারী-নির্যাতন-কারীদের মহানিধনের কাজে।

বছরে দু-বার বসিত হেথায় রথ-যাত্রার মেলা,
কত যে দোকান পসারী আসিত কত সার্কাস খেলা।
কোথাও গাজীর গানের আসরে খোলের মধুর সুরে।
কত যে বাদশা বাদশাজাদীরা হেথায় যাইত ঘুরে।
শ্রোতাদের মনে জাগায়ে তুলিত কত মহিমার কথা,
কত আদর্শ নীতির ন্যায়ের গাঁথিয়া সুরের লতা।

পুতুলের মত ছেলেরা মেয়েরা পুতুল লইয়া হাতে।
খুশির কুসুম ছড়ায়ে চলিত বাপ ভাইদের সাথে!
কোন যাদুকর গড়েছিল রথ তুচ্ছ কি কাঠ নিয়া,
কি মায়া তাহাতে মেখে দিয়েছিল নিজ হৃদি নিঙাড়িয়া।
তাহারি মায়ায় বছর বছর কোটি কোটি লোক আসি,
রথের সামনে দোলায়ে যাইত প্রীতির প্রদীপ হাসি।

পাকিস্তানের রক্ষাকারীরা পরিয়া নীতির বেশ,
এই রথখানি আগুনে পোড়ায়ে করিল ভস্মশেষ।
শিল্পীহাতের মহা সান্ত্বনা যুগের যুগের তরে,
একটি নিমেষে শেষ করে গেল এসে কোন বর্বরে!

জন্মাবধি সেই দিনগুলিতে (১৯৭২)

নক্সী কাঁথার মাঠ

এক

বন্ধুর বাড়ি আমার বাড়ি মধ্যে ক্ষীর নদী,
উইড়া যাওয়ার সাধ ছিল, পাঙ্খা দেয় নাই বিধি।
– রাখালী গান

এই এক গাঁও, ওই এক গাঁও – মধ্যে ধু ধু মাঠ,
ধান কাউনের লিখন লিখি করছে নিতুই পাঠ।
এ-গাঁও যেন ফাঁকা ফাঁকা, হেথায় হোথায় গাছ;
গেঁয়ো চাষীর ঘরগুলি সব দাঁড়ায় তারি পাছ।
ও-গাঁয় যেন জমাট বেঁধে বনের কাজল-কায়া,
ঘরগুলিরে জড়িয়ে ধরে বাড়ায় বনের মায়া।

এ-গাঁও যেন ও-গাঁর দিকে, ও-গাঁও এ-গাঁর পানে,
কতদিন যে কাটবে এমন, কেইবা তাহা জানে!
মাঝখানেতে জলীর বিলে জ্বলে কাজল-জল,
বক্ষে তাহার জল-কুমুদী মেলছে শতদল।
এ-গাঁর ও-গাঁর দুধার হতে পথ দুখানি এসে,
জলীর বিলের জলে তারা পদ্ম ভাসায় হেসে!
কেউবা বলে – আদ্যিকালের এই গাঁর এক চাষী,
ওই গাঁর এক মেয়ের প্রেমে গলায় পরে ফাঁসি;
এ-পথ দিয়ে একলা মনে চলছিল ওই গাঁয়ে,
ও-গাঁর মেয়ে আসছিল সে নূপুর-পরা পায়ে!

এইখানেতে এসে তারা পথ হারায়ে হায়,
জলীর বিলে ঘুমিয়ে আছে জল-কুমুদীর গায়ে।
কেইবা জানে হয়ত তাদের মাল্য হতেই খসি,
শাপলা-লতা মেলছে পরাগ জলের উপর বসি ।
মাঠের মাঝের জলীর বিলের জোলো রঙের টিপ,
জ্বলছে যেন এ-গাঁর ও-গাঁর বিরহেরি দীপ!
বুকে তাহার এ-গাঁর ও-গাঁর হরেক রঙের পাখি,

মিলায় সেথা নতুন জগৎ নানান সুরে ডাকি।
সন্ধ্যা হলে এ-গাঁর পাখি ও-গাঁর পানে ধায়,
ও-গাঁর পাখি এ-গাঁয় আসে বনের কাজল ছায়।
এ-গাঁর লোকে নাইতে আসে, ও-গাঁর লোকও আসে
জলীর বিলের জলে তারা জলের খেলায় ভাসে।

এ-গাঁও ও-গাঁও মধ্যে ত দূর – শুধুই জলের ডাক,
তবু যেন এ-গাঁয় ও-গাঁয় নাইক কোন ফাঁক।
ও-গাঁর বধূ ঘট ভরিতে যে ঢেউ জলে জাগে,
কখন কখন দোলা তাহার এ-গাঁয় এসে লাগে।
এ-গাঁর চাষী নিঘুম রাতে বাঁশের বাঁশীর সুরে,
ওইনা গাঁয়ের মেয়ের সাথে গহন ব্যথায় ঝুরে!
এ-গাঁও হতে ভাটীর সুরে কাঁদে যখন গান,
ও-গাঁর মেয়ে বেড়ার ফাঁকে বাড়ায় তখন কান।
এ-গাঁও ও-গাঁও মেশামেশি কেবল সুরে সুরে;
অনেক কাজে এরা ওরা অনেকখানি দূরে।

এ-গাঁর লোকে দল বাঁধিয়া ও-গাঁর লোকের সনে,
কাইজা[১] ফ্যাসাদ্[২] করেছে যা জানেই জনে জনে।
এ-গাঁর লোকও করতে পরখ্ ও-গাঁর লোকের বল,
অনেক বারই লাল করেছে জলীর বিলের জল।
তবুও ভাল, এ-গাঁও ও-গাঁও, আর যে সবুজ মাঠ,
মাঝখানে তার ধুলায় দোলে দুখান দীঘল বাট;
দুই পাশে তার ধান-কাউনের অথই রঙের মেলা,
এ-গাঁর হাওয়ায় দোলে দেখি ও-গাঁয় যাওয়ার ভেলা।

১. কাইজা = মারামারি ২. ফ্যাসাদ = ঝগড়া

দুই

এক কালা দাতের কালি যা দ্যা কলম লেখি,
আর এক কালা চক্ষের মণি, যা দ্যা দৈনা দেখি,
– ও কালা, ঘরে রইতে দিলি না আমারে ।

– মুর্শিদা গান

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে লম্বা মাথার চুল,
কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কিসের রঙিন ফুল!
কাঁচা ধানের পাতার মত কচি-মুখের মায়া,
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।
জালি লাউয়ের ডগার মত বাহু দুখান সরু,
গা খানি তার শাঙন মাসের যেমন তমাল তরু।
বাদল-ধোয়া মেঘে কেগো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজলী মেয়ে পিছলে পড়ে ছড়িয়ে আলোর খেল।
কচি ধানের তুলতে চারা হয়ত কোনো চাষী,
মুখে তাহার জড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি।

কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দাঁতের কালি দিয়েই কেতাব কোরাণ লেখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়;
চাষীদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়।

তেরো

বিদ্যাশেতে রইলা মোর বন্ধুরে।
বিধি যদি দিত পাখা,
উইড়া যায়া দিতাম দেখা;
আমি উইড়া পড়তাম সোনা বন্ধুর দেশেরে।
আমরা ত অবলা নারী,
তরুতলে বাসা বান্ধিরে;
আমার বদন চুয়ায়া পড়ে ঘামরে।
বন্ধুর বাড়ী গঙ্গার পার
গেলে না আসিবা আর;
আমার না-জান বন্ধু, না জানে সাঁতাররে।
বন্ধু যদি আমার হও
উইড়া আইসা দেখা দাও
তুমি দাও দেখা জুড়াক পরাণরে।

– রাখালী গান

একটি বছর হইয়াছে সেই রূপাই গিয়াছে চলি,
দিনে দিনে নব আশা লয়ে সাজুরে গিয়াছে ছলি।
কাইজায় যারা গিয়াছিল গাঁয়, তারা ফিরিয়াছে বাড়ি,
শহরের জজ, মামলা হইতে সবারে দিয়াছে ছাড়ি।
স্বামীর বাড়িতে একা মেয়ে সাজু কি করে থাকিতে পারে,
তাহার মায়ের নিকটে সকলে আনিয়া রাখিল তারে।
একটি বছর কেটেছে সাজুর একটি যুগের মত,
প্রতিদিন আসি, বুকখানি তার করিয়াছে শুধু ক্ষত।

ও-গাঁয়ে রূপার ভাঙা ঘরখানি মেঘ ও বাতাসে হায়,
খুঁটি ছেড়ে আজ হামাগুড়ি দিয়ে পড়েছে পথের গায়।
প্রতি পলে পলে খসিয়া পড়িছে তাহার চালের ছানি,
তারও চেয়ে আজি জীর্ণ শীর্ণ সাজুর হৃদয়খানি।

দুখের রজনী যদিও বা কাটে – আসে যে দুখের দিন,
রাত দিন দুটি ভাই বোন যেন দুখেরই বাজায় বীণ।
কৃষাণীর মেয়ে, এতটুকু বুক, এতটুকু তার প্রাণ,
কি করিয়া সহে দুনিয়া জুড়িয়া অসহ দুখের দান!
কেন বিধি তারে এত দুখ দিল, কেন, কেন, হায় কেন,
মনের-মতন কাঁদায় তাহারে 'পথের কাঙালী' হেন?

সোঁতের শেহলা ভাসে সোঁতে সোঁতে, সোঁতে সোঁতে ভাসে পানা,
দুখের সাগরে ভাসিছে তেমনি সাজুর হৃদয়খানা।
কোন্ জালুয়ার[১] মাছ সে খেয়েছে নাহি দিয়ে তার কড়ি,
তারি অভিশাপ ফিরেছে কি তার সকল পরাণ ভরি!
কাহার গাছের জালি কুমড়া সে ছিঁড়েছিল নিজ হাতে,
তাহারি ছোঁয়া কি লাগিয়াছে আজ তার জীবনের পাতে!
তোর দেশে বুঝি দয়া মায়া নাই, হা-রে নিদারুণ বিধি
কোন্ প্রাণে তুই কেড়ে নিয়ে গেলি তার আঁচলের নিধি।
নয়ন হইতে উড়ে গেছে হায় তার নয়নের তোতা,
যে ব্যথারে সাজু বহিতে পারে না, আজ তা রাখিবে কোথা?

এমনি করিয়া কাঁদিয়া সাজুর সারাটি দিবস কাটে,
আমেনে কভু একা চেয়ে রয় দীঘল গাঁয়ের বাটে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকাল যে কাটে – দুপুর কাটিয়া যায়,
সন্ধ্যার কোলে দীপ নিবু-নিবু সোনালী মেঘের নায়।
তবু ত আসে না! বুকখানি সাজু নখে নখে আজ ধরে,
পারে যদি তবে ছিঁড়িয়া ফেলায় সন্ধ্যার কাল গোরে।

মেয়ের এমন দশা দেখে মার সুখ নাই কোন মনে,
রূপারে তোমরা দেখেছো কি কেউ, শুধায় সে জনে জনে।
গাঁয়ের সবাই অন্ধ হয়েছে, এত লোক হাটে যায়,
কোন দিন কিগো রূপাই তাদের চক্ষে পড়ে নি হায়!
খুব ভাল করে খোঁজে যেন তারে, বুড়ী ভাবে মনে মনে,
রূপাই কোথাও পালাইয়া আছে হয়ত হাটের কোণে।

[১] জালুয়া = জেলে।

ভাদ্র মাসেতে পাটের বেপারে কেউ কেউ যায় গাঁর
নানা দেশে তারা নাও বেয়ে যায় পদ্মানদীর পার।
জনে জনে বুড়ী বলে দেয়, 'দেখ, যখন যেখানে যাও,
রূপার তোমরা তালাস লইও, খোদার কছম খাও।'
বর্ষার শেষে আনন্দে তারা ফিরে আসে নায়ে নায়ে,
বুড়ী ডেকে কয়, 'রূপারে তোমরা দেখ নাই কোন গাঁয়ে!'
বুড়ীর কথার উত্তর দিতে তারা নাহি পায় ভাষা,
কি করিয়া কহে, আর আসিবে না যে পাখি ছেড়েছে বাসা।

চৈত্র মাসেতে পশ্চিম হতে জন খাটিবার তরে,
মাথাল মাথায় বিদেশী চাষীরা সারা গাঁও ফেলে ভরে।
সাজুর মায়ে যে ডাকিয়া তাদের বসায় বাড়ির কাছে,
তামাক খাইতে হুঁকো এনে দ্যায়, জিজ্ঞাসা করে পাছে;
'তোমরা কি কেউ রূপাই বলিয়া দেখেছ কোথাও কারে,
নিটল তাহার গঠন গাঠন, কথা কয় ভারে ভারে।'
এমনি করিয়া বলে বুড়ী কথা, তাহারা চাহিয়া রয়, –
রূপারে যে তারা দেখে নাই কোথা, কেমন করিয়া কয়!
যে গাছ ভেঙেছে ঝড়িয়া বাতাসে কেমন করিয়া হায়,
তারি ডালগুলো ভেঙে যাবে তারা কঠোর কুঠার-ঘায়?

কেউ কেউ বলে, 'তাহারি মতন দেখেছিনু একজনে,
আমাদের সেই ছোট গাঁর পথে চলে যেতে আনমনে।'
'আচ্ছা তাহারে শুধাও নি কেহ, কখন আসিবে বাড়ী,
পরদেশে সে যে কোন্‌প্রাণে রয় আমার সাজুরে ছাড়ি?'
গাছে-পড়া-লোক যেমন করে তৃণটি আঁকড়ি ধরে,
তেমনি করিয়া চেয়ে রয় বুড়ী তাদের মুখের পরে।
মিথ্যা করেই তারা বলে, 'সে যে আসিবে ভাদ্র মাসে,
খবর দিয়েছে, বুড়ী যেন আর কাঁদে না তাহার আশে।'
এত যে বেদনা তবু তারি মাঝে একটু আশার কথা,
মুহূর্তে যেন মুছাইয়া দেয় কত বরষের ব্যথা।
মেয়েরে ডাকিয়া বার বার কহে, 'ভাবিস না মাগো আর,
বিদেশী চাষীরা কয়ে গেল মোরে – খবর পেয়েছে তার।

মেয়ে শুধু দুটি ভাষা-ভরা আঁখি ফিরাল মায়ের পানে;
কত ব্যথা তার কমিল ইহাতে সেই তাহা আজ জানে।
গণিতে গণিতে শ্রাবণ কাটিল, আসিল ভাদ্র মাস,
বিরহী নারীর নয়নের জলে ভিজিল বুকের বাস।

আজকে আসিবে কালকে আসিবে, হায় নিদারুণ আশা,
ভোরের পাখির মতন শুধুই ভোরে ছেড়ে যায় বাসা।
আজকে কত না কথা লয়ে যেন বাজিছে বুকের বীণে,
সেই যে প্রথম দেখিল রূপারে বদনা-বিয়ের দিনে।
তারপর, সেই হাট ফেরা পথে তারে দেখিবার তরে,
ছল করে সাজু দাঁড়ায়ে থাকিত গাঁয়ের পথের পরে।
নানা ছুতো ধরি কত উপহার তারে যে দিত আনি,
সেই সব কথা আজ তার মনে করিতেছে কানাকানি।
সারা নদী ভরি জাল ফেলে জেলে যেমনি করিয়া টানে,
কখন উঠায়, কখন নামায়, যত লয় তার প্রাণে;
তেমনি সে তার অতীতেরে আজি জালে জালে জড়াইয়া টানে,
যদি কোন কথা আজিকার দিনে কয়ে যায় নব-মানে।

আর যেন তার কোন কাজ নাই, অতীত আঁধার গাঙে,
ডুবারুর মত ডুবিয়া ডুবিয়া মানক মুকুতা মাঙে।
এতটুকু মান, এতটুকু স্নেহ, এতটুকু হাসি খেলা,
তারি সাথে সাজু ভাসাইতে চায় কত না সুখের ভেলা!
হায় অভাগিনী! সে ত নাহি জানে আগে যারা ছিল ফুল,
তারাই আজিকে ভুজঙ্গ হয়ে দহিছে প্রাণের মূল।
যে বাঁশী শুনিয়া ঘুমাইত সাজু, আজি তার কথা স্মরি,
দহন নাগের গলা জড়াইয়া একা জাগে বিভাবরী।

মনে পড়ে আজ সেই শেষ দিনে রূপার বিদায় বাণী –
'মোর কথা যদি মনে পড়ে তবে পরিও সিঁদুরখানি।'
আরও মনে পড়ে, 'দীন দুঃখীর যে ছাড়া ভরসা নাই,
সেই আল্লার চরণে আজিকে তোমারে সঁপিয়া যাই।'

হায় হায় পতি, তুমি ত জান না কি নিঠুর তার মন;
সাজুর বেদনা সকলেই শোনে, 'শোনে না সে একজন।
গাছের পাতারা ঝড়ে পড়ে পথে, পশুপাখি কাঁদে বনে,
পাড়া প্রতিবেশী নিতি নিতি এসে কেঁদে যায় তারি সনে।
হায়রে বধির, তোর কানে আজ যায় না সাজুর কথা;
কোথা গেলে সাজু জুড়াইবে এই বুক ভরা ব্যথা।
হায় হায় পতি, তুমি ত ছাড়িয়া রয়েছ দূরের দেশে,
আমার জীবন কি করে কাটিবে কয়ে যাও কাছে এসে!
দেখে যাও তুমি দেখে যাও পতি তোমার লাউ-এর লতা,
পাতাগুলি তার উনিয়া পড়েছে লয়ে কি দারুণ ব্যথা।
হালের খেতেতে মন টিকিত না আধা কাজ ফেলি বাকি,
আমারে দেখিতে বাড়ি যে আসিতে করি কতরূপ ফাঁকি।
সেই মোরে ছেড়ে কি করে কাটাও দীর্ঘ বরষ মাস,
বলিতে বলিতে ব্যথার দহনে থেমে আসে যেন শ্বাস।

নক্সী কাঁথাটি বিছাইয়া সাজু সারারাত আঁকে ছবি,
যেন সে তাহার গোপন ব্যথার বিরহিয়া এক কবি।
অনেক সুখের দুখের স্মৃতি ওরি বুকে আছে লেখা,
তার জীবনের ইতিহাসখানি কহিছে রেখায় রেখা।
এই কাঁথা যবে আরম্ভ করে তখন সে একদিন,
কৃষাণীর ঘরে আদরিণী মেয়ে সারা গায়ে সুখ-চিন।
স্বামী বসে তার বাঁশী বাজায়েছে, সিলাই করেছে সে যে;
গুন গুন করে গান কভু রাঙা ঠোঁটেতে উঠেছে বেজে ।

সেই কাঁথা আজো মেলিয়াছে সাজু যদিও সেদিন নাই,
সোনার স্বপন আজিকে তাহার পুড়িয়া হয়েছে ছাই।

খুব ধরে ধরে আঁকিল যে সাজু রূপার বিদায় ছবি,
খানিক যাইয়া ফিরে ফিরে আসা, আঁকিল সে তার সবি।
আঁকিল কাঁথায় – আলু থালু বেশে চাহিয়া কৃষাণ-নারী,
দেখিছে – তাহার স্বামী তারে যায় জনমের মত ছাড়ি।

আঁকিতে আঁকিতে চোখে জল আসে, চাহনি যে যায় ধুয়ে,
বুকে কর হানি, কাঁথার উপরে পড়িল যে সাজু শুয়ে।
এমনি করিয়া বহুদিন যায়, মানুষে যত না সহে,
তার চেয়ে সাজু অসহ্য ব্যথা আপনার বুকে বহে।
তারপর শেষে এমনি হইল, বেদনার ঘায়ে ঘায়ে,
এমন সোনার তনুখানি তার ভাঙিল ঝরিয়া-বায়ে।
কি যে দারুণ রোগেতে ধরিল, উঠিতে পারে না আর;
শিয়রে বসিয়া দুঃখিনী জননী মুছিল নয়ন-ধার।
হায় অভাগীর একটি মানিক! খোদা তুমি ফিরে চাও,
এরে যদি নিবে তার আগে তুমি মায়েরে লইয়া যাও!
ফিরে চাও তুমি আল্লা রসুল! রহমান তব নাম,
দুনিয়ায় আর কহিবে না কেহ তারে যদি হও বাম!

মেয়ে কয়, 'মাগো! তোমার বেদনা আমি সব জানি,
তার চেয়ে যে গো অসহ্য ব্যথা ভাঙে মোর বুকখানি!
সোনা মা আমার! চক্ষু মুছিয়া কথা শোন, খাও মাথা,
ঘরের মেঝেয় মেলে ধর দেখি আমার নক্সী-কাঁথা!
একটু আমারে ধর দেখি মাগো, সুঁচ সুতা দাও হাতে,
শেষ ছবিখানা এঁকে দেখি যদি কোন সুখ হয় তাতে।'
পাণ্ডুর হাতে সুঁচ লয়ে সাজু আঁকে খুব ধীরে ধীরে,
আঁকিয়া আঁকিয়া আঁখিজল মুছে দেখে কত ফিরে ফিরে।

কাঁথার উপরে আঁকিল যে সাজু তাহার কবরখানি,
তারি কাছে এক গেঁয়ো রাখালের ছবিখানি দিল টানি;
রাত আন্ধার, কবরের পাশে বসি বিরহীর বেশে,
অঝোরে বাজায় বাঁশের বাঁশীটি বুক যায় জলে ভেসে।

মনের মতন আঁকি এই ছবি দেখে বার বার করি,
দুটি পোড়া চোখ বারবার শুধু অশ্রুতে উঠে ভরি।
দেখিয়া দেখিয়া ক্লান্ত হইয়া কহিল মায়েরে ডাকি,
'সোনা মা আমার! সত্যিই যদি তোরে দিয়ে যাই ফাঁকি;
এই কাঁথাখানি বিছাইয়া দিও আমার কবর পরে,
ভোরের শিশির কাঁদিয়া কাঁদিয়া এরি বুকে যাবে ঝরে!

সে যদি গো আর ফিরে আসে কভু, তার নয়নের জল,
জানি জানি মোর কবরের মাটি ভিজাইবে অবিরল।
হয়ত আমার কবরের ঘুম ভেঙে যাবে মাগো তাতে,
হয়ত তাহারে কাঁদাইতে আমি জাগিব অনেক রাতে।
এ ব্যথা সে মাগো কেমনে সহিবে, বোলো তারে ভালো করে,
তার আঁখি জল ফেলে যেন এই নক্সী-কাঁথার পরে।
মোর যত ব্যথা, মোর যত কাঁদা এরি বুকে লিখে যাই,
আমি মোলে মোর কবরের গায়ে এরে মেলে দিও তাই!
মোর ব্যথা সাথে তার ব্যথাখানি দেখে যেন মিল করে,
জনমের মত সব কাঁদা আমি লিখে গেনু কাঁথা ভরে।'
বলিতে বলিতে আর যে পারে না, জড়াইয়া আসে কথা,
অচেতন হয়ে পড়িল যে সাজু লয়ে কি দারুণ ব্যথা।

কানের কাছেতে মুখ লয়ে মাতা ডাক ছাড়ি কেঁদে কয়,
'সাজু সাজু! তুই মোরে ছেড়ে যাবি এই তোর মনে লয়?'
'আল্লা রসুল! আল্লা রসুল!' বুড়ী বলে হাত তুলে,
'দীন দুঃখীর শেষ কান্না এ, আজিকে যেয়ো না ভুলে!'
দুই হাতে বুড়ী জড়াইতে চায় আঁধার রাতের কালি,
উতলা বাতাস ধীরে ধীরে বলে যায়, সব খালি! সব খালি!!
'সোনা সাজুরে, মুখ তুলে চাও, বলে যাও আজ মোরে,
তোমারে ছাড়িয়া কি করে যে দিন কাটিবে একেলা ঘরে!'

দুখিনী মায়ের কান্নায় আজি খোদার আরশ কাঁপে,
রাতের আঁধার জড়াজড়ি করে উতল হাওয়ার দাপে।

চোদ্দ

উইড়া যাওরে হংস পক্ষি পইড়া রয়রে ছায়া,
দেশের মানুষ দেশে যাইব – কে করিবে মায়া।
– মুর্শিদা গান

আজো এই গাঁও অঝোরে চাহিয়া ওই গাঁওটির পানে,
নীরবে বসিয়া কোন কথা যেন কহিতেছে কানে কানে।
মধ্যে অথই শুনো মাঠখানি ফাটলে ফাটলে ফাটি,
ফাগুনের রোদে শুখাইছে যেন কি ব্যথারে মূক মাটি!

নিঠুর চাষীরা বুক হতে তার ধানের বসনখানি,
কোন্ সে বিরল পল্লীর ঘরে নিয়ে গেছে হায় টানি!
বাতাসের পায়ে বাজে না আজিকে ঝল মল মল গান,
মাঠের ধূলায় পাক খেয়ে পড়ে কত যেন হয় ম্লান!
সোনার সীতারে হরেছে রাবণ, পল্লীর পথ পরে,
মুঠি মুঠি ধানে গহনা তাহার পড়িয়াছে বুঝি ঝরে!
মাঠে মাঠে কাঁদে কলমীর লতা, কাঁদে মটরের ফুল,
এই একা মাঠে কি করিয়া তারা রাখিবেগো জাতি-কূল।
লাঙল আজিকে হয়েছে পাগল, কঠিন মাটিরে চিরে,
বুকখানি তার নাড়িয়া নাড়িয়া ঢেলারে ভাঙিবে শিরে।
তবু এই গাঁও রহিয়াছে চেয়ে, ওই গাঁওটির পানে,
কতদিন তারা এমনি কাটাবে কেবা তাহা আজ জানে।
মধ্যে লুটায় দিগন্ত-জোড়া নক্সী-কাঁথার মাঠ;
সারা বুক ভরি কি কথা সে লিখি, নীরবে করিছে পাঠ!
এমন নাম ত শুনিনি মাঠের? যদি লাগে কারো ধাঁধা,
যারে তারে তুমি শুধাইয়া নিও, নাই কোন এর বাধা।

সকলেই জানে, সেই কোন্ কালে রূপা বলে এক চাষী,
ওই গাঁর এক মেয়ের প্রেমেতে গলায় পড়িল ফাঁসি।
বিয়েও তাদের হয়েছিল ভাই, কিন্তু কপাল-লেখা,
খণ্ডাবে কেবা? দারুণ দুঃখ ভালে এঁকে গেল রেখা।
রূপা একদিন ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে গেল দূর দেশে,
তারি আশা-পথে চাহিয়া চাহিয়া বউটি মরিল শেষে।
মরিবার কালে বলে গিয়েছিল – তাহার নক্সী-কাঁথা,
কবরের গায়ে মেলে দেয় যেন বিরহিণী তার মাতা!

বহুদিন পরে গাঁয়ের লোকেরা গভীর রাতের কালে, –
শুনিল কে যেন বাজাইছে বাঁশী বেদনার তালে তালে।
প্রভাতে সকলে দেখিল আসিয়া সেই কবরের গায়,
রোগ পাণ্ডুর একটি বিদেশী মরিয়া রয়েছে হায়!
শিয়রের কাছে পড়ে আছে তার কথানা রঙীন শাড়ী,
রাঙা মেঘ বেয়ে দিবসের রবি যেন চলে গেছে বাড়ি!

সারা গায় তার জড়ায়ে রয়েছে সেই নক্সী-কাঁথা, –
আজও গাঁর লোকে বাঁশী বাজাইয়া গায় এ করুণ গাথা।

কেহ কেহ নাকি গভীর রাত্রে দেখেছে মাঠের পরে, –
মহা-শূন্যেতে উড়িয়াছে কেবা নক্সী-কাঁথাটি ধরে;
হাতে তার সেই বাঁশের বাঁশীটি বাজায় করুণ সুরে,
তারি ঢেউ লাগি এ-গাঁও ও-গাঁও গহন ব্যথায় ঝুরে।
সেই হতে গাঁর নামটি হয়েছে নক্সী-কাঁথার মাঠ,
ছেলে বুড়ো গাঁর সকলেই জানে ইহার করুণ পাঠ।

নক্সী কাঁথার মাঠ
প্রথম প্রকাশ : ১৩৩৬ / ১৯২৯
দ্বিতীয় প্রকাশ : এপ্রিল ২০১০
(অংশবিশেষ)

সোজন বাদিয়ার ঘাট

এক

'যাদু! এ তো বড় রঙ্গ, যাদু! এ তো বড় রঙ্গ,
চার কালো দেখাতে পারো, যাবো তোমার সঙ্গ।'
'কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ,
তাহার অধিক কালো, কনে, তোমার মাথার কেশ।'
– ছেলে-ভুলান ছড়া

ইতল বেতল ফুলের বনে ফুল ঝুর ঝুর করেরে ভাই,
ফুল ঝুর ঝুর করে;
দেখে এলাম কালো-মেয়ে গদাই নমুর ঘরে।
ধানের আগায় ধানের ছড়া, তাহার পরে টিয়া,
নমুর মেয়ের গায়ের ঝলক সেই না রঙ নিয়া।
দূর্বাবনে রাখলে তারে দূর্বাতে যায় মিশে,
মেঘের খাটে শুইয়ে দিলে খুঁজে না পাই দিশে।
লাউয়ের ডগায় লাউয়ের পাতা, রৌদ্রে উনে যায়,
সেই লতারি সোহাগ যেন মাখা তারি গায়।
যে পথ দিয়ে যায় চলে সে যে পথ দিয়ে আসে,
সে পথ দিয়ে মেঘ চলে যায়, বিজলী বরণ হাসে।
বনের মাঝে বনের লতা, পাতায় পাতায় ফুল,
সেও জানে না নমু মেয়ের শ্যামল শোভার তুল।
যে মেঘেরে জড়িয়ে ধরে হাসে রামের ধনু,
রঙিন শাড়ী হাসে যে তার জড়িয়ে সেই তনু।

গায়ে তাহার গয়না নাহি, হাতে কাচের চুড়ি;
দুই পায়েতে কাঁসার খাড়ু, বাজছে ঘুরি ঘুরি।
এতেই তারে মানিয়েছে যা তুলনা নেই তার;
যে দেখে সে অমনি বলে, দেখে লই আরবার।
সোনা রূপার গয়না তাহার পরিয়ে দিলে গায়,
বাড়ত না রূপ, অপমানই করতে হত তায়।

ছিপছিপে তার পাতলা গঠন, হাত-চোখ-মুখ-কান,
খেলছে দুলছে মেলছে গায়ে গয়না শতখান।

হাবড়া পুজোর ছড়ার মত ফুরফুরিয়ে ঘোরে,
হেথায় হোথায় যথায় তথায় মনের খুশীর ভরে।
বেথুল তুলে, ফুল কুড়িয়ে, ভেঙে ফলের ডাল,
সারাটি গাঁও টহল দিয়ে কাটে তাহার কাল।
পুতুল আছে অনেকগুলো, বিয়ের গাহি গান,
নিমন্ত্রণে লোক ডাকি সে হয় যে লবেজান।
এসব কাজে সোজন তাহার সবার চেয়ে সেরা,
ছমির শেখের ভাজন বেটা, বাবরী মাথায় ঘেরা।

কোন বনেতে কটার বাসায় বাড়ছে ছোট ছানা,
ডাহুক কোথায় ডিম পাড়ে তার নখের আগায় জানা।
সবার সেরা আমের আঁটির গড়তে জানে বাঁশী,
উঁচু ডালের পাকা কুলটি পাড়তে পাড়ে হাসি।
বাঁশের পাতায় নথ গড়ায়ে গাবের গাঁথি হার,
অনেক কালই জয় করেছে শিশু মনটি তার।

ডাপ ডুমাডুম বাদ্যি বাজে কাল শিয়ালের বিয়ে,
শিয়াল চলে শ্বশুর বাড়ি খালুই মাথায় দিয়ে।
কঙ্কাবতীর বরের বাড়ি সাত সাগরের পার,
নীল কমলে সাঁতার খেলে ধরি তাহার ধার।
উলু উলু মাদারের ফুল তুলতে গেলাম বনে,
দেখে এলাম গাছের ডালে চম্পাবরণ কনে;
চম্পাবরণ কনে বালো – কঙ্কাবতীর সই,
খবর তাহার কেউ জানে না তারা দুজন বই।
নানান সুরের ছড়ার নুপুর জড়িয়ে দুটি পায়,
খেলার ছলি নাচে তারা গাঙ-শালিকের প্রায়।

দুই

নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ,
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।
– গাজীর গান

শিমুলতলী গাঁয়ে,
গাছের পাতা বাতাস করে মাটির শীতল ছায়ে।
নমু মুসলমানের আবাস, গলায় গলা ধরি,
খেড়ো ঘরের চালগুলো সব হাস্‌ছে মরি মরি।
নমু পাড়ায় পূজা পরব, শঙ্খ কাঁসর বাজে,
বউ-ঝিরা সব জয় জোকারে উৎসবেতে সাজে।
মুসলমানের পাড়ায় বসে ঈদের মহোৎসব,
মেজবানী দেয় ছেলে বুড়োয় করিয়ে কলরব।
মোরগ ডাকে, মুরগী ডাকে, পেঁয়াজ রসুন বাটি,
তরকারিতে দেয় যে ফোড়ং; বাতাস হলে ভাটি।
নমু পাড়ায় গন্ধ তাহার যায় যে মাঝে মাঝে,
এতে তাদের হয় না ব্যাঘাত কোন রকম কাজে।

চড়ক পূজায় গাজন গাহি নাচে নমুর দল,
চৈতী ঢাকের বাদ্য শুনি, গাঁও করে টল্‌মল্।
কীর্তনেতে তুলিয়ে বাহু জাগায় কলরোল,
মসজিদে তার বাজনা গেলে হয় না কোন গোল।
বরং সেথা মাঝে মাঝে ইহাও দেখা যায়,
হিঁদুর পূজায় মুসলমান বয়েত গাহেন গায়।
সরস্বতী পূজার লাড়ু গড়িয়ে দু-চার জোড়া,
মুসলমানের ঠোঁট ছুঁয়েছে তাও দেখেছি মোরা।
ছোঁয়া-ছুঁয়ির এতই যে বাড়, পীরের পড়া জল,
নমুর পোলার পীড়ার দিনে হয়নি তা বিফল।
দরগাতলায় করতে প্রণাম ভালের সিঁদুর দিয়ে;
নমুর মেয়ে লাল করে যায় শুকনো মাটির হিয়ে।

নমু বাড়ির তমাল তরু মেলি চিকন ডাল,
মুসলমানের উঠান বেড়ে দুলছে চিরকাল।
মোল্লাবাড়ির জাঙলা হতে ঢাকাই সীমের লতা,
জাজন নমুর ঘরটি ধরে কইছে মনের কথা।
কিবা নমু, কি মুসলমান কারো তরফ হতে,
ইহার কোন প্রতিবাদই হয়নি কোন মতে।
গরীব তারা, ছোট-খাটো সুখ-দুঃখ লয়ে,
শিমুলতলীর গাঁয়ের মাঝে আছে যে এক হয়ে।
মুসলমানের মরলে ছেলে যে দুখ সহে মায়,
নমু মেয়ের তুলসীতলায় প্রদীপ দোলে তায়।
স্বামীরে তার চিতায় দিয়ে বিধুর নমু-নারী,
শ্মশানঘাটায় শঙ্খ সিঁদুর যায় যখনে ছাড়ি;
তখন তাহার আপন জনের যেমনি ব্যথা হয়,
মুসলমানী সখীর ব্যথা কম তা হতে নয়।

কবরে যে ঘুমায় ব্যথা, চিতায় যে দুখ জ্বলে,
এক হয়ে তা নমু মুসলমানের বুকে দোলে।
এ-সব তারা শিখ্‌ল কোথায়? কোরান পুরাণ পড়ে,
পায়নি ইহার হদিস তারা বলছি শপথ করে।
মাথায় তাদের একই আকাশ দোলায় নীলের মায়া,
একই বাতাস দোলায় তাদের বনের কাজল ছায়া।
মাঠে তাহাদের সমান ঢালু, বৃষ্টি পড়া জল,
এদিক থেকে ওদিক যেয়ে করে যে টলমল।
মুসলমানের বেড়ার ফাঁকে যে চাঁদ পশে ঘরে,
নমুর উঠান বেড়ি সে চাঁদ নিতুই খেলা করে।
কেমনি এরা একের ব্যথা লয় যে সবার ভাগে,
একের ঘরের সুখের দোলা আরের ঘরে লাগে।

নমুর মধ্যে নমুর সেরা গদাই মোড়ল নাম,
দেখতে যেমন নামেও তেমন – তেমন তাহার কাম।
বড় ঘরের চালের আগা আকাশ ছুঁতে চায়,
সুপুরি গাছ বাড়িয়ে বাহু বারণ করে তায়।

আথালে তার দশটি বলদ, চারখানা বায় হাল,
দশটি রাখাল সামাল সামাল রাখতে তাদের তাল।

গরব তাহার মস্ত বড় আছে ধানের গোলা,
আর আছে তার জোয়ান জোয়ান সাতটি ভাজল পোলা।
আরেক গরব গিন্নী আছেন, হয়ত বা ভুল করে,
লক্ষ্মী দেবী নিজেই বাঁধা পড়েছে তার ঘরে।
পাড়ায় পাড়ায় কোঁদল করে যে ধারে তেল নুন,
ফেরেন তিনি মল বাজায়ে গেয়ে তাহার গুণ।
পান হতে তার চুন খসাবে এমন বাপের ছেলে,
শপথ করে বলতে পারি দশ গাঁয়ে না মেলে।
সাত ঘাটে জল এক করে সে ভরতে পারে ঘড়া,
পাতাল পুরীর সংখ্যা বালির নখেতে তার পড়া।

আরো গরব আছে যে তার হাতের লাঠিখানি,
থাকতে হাতে ভয় করে না কোনই জন-প্রাণী!
ইহার চেয়েও গরব তাহার লক্ষ্মী মেয়ে ঘরে,
দুলালী নাম, দুলী বলেই ডাকে আদর করে।
সারাটা দিন খেলেই বেড়ায় এঁদো পুকুর কোণে,
বন-বাদাড়ে ফুল কুড়ায়ে ফেরে সখীর সনে।
পায়ে তাহার কাঁসার খাড়ু ঝামুর-ঝুমুর বাজে,
সারাক্ষণই ব্যস্ত আছে নানান রকম কাজে।
পুতুলগুলির অন্নপ্রাশন, কুকুর ছানার বিয়ে,
দিন যে তাহার যায় এমনই কত না কাজ নিয়ে।
বলেছি ত সকল কাজেই সোজন তাহার জুড়ি,
হাজার খেলার ফন্দী আঁটে সারাটি গাঁও ঘুরি।

তিন

আয়রে ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটলো, দোলায় চেপে যাই;
দোলায় আছে ছপণ কড়ি গণতে গণতে যাই।
ও নদীর জলটুকু টলমল করে,
এ নদীর ধারেরে ভাই বালি ঝুর ঝুর করে,
চাঁদ মুখেতে রোদ লেগেছে রক্ত ফেটে পড়ে।
– ছেলে-ভুলান ছড়া

নমুদের মেয়ে আর সোজনের ভারি ভাব দুইজনে,
লতার সঙ্গে গাছের মিলন, গাছের লতার সনে।
সোজন যেন বা তটিনীর কূল, দুলালী নদীর পানি,
জোয়ারে ফুলিয়া ঢেউ আছাড়িয়া করে কূল টানাটানি।
নামেও সোজন, কামেও তেমনি, শান্ত স্বভাব তার,
কূল ভেঙে নদী যতই বহুক, সে তারি গলার হার।
দুলালী সে যেন বনের হরিণী, সোজন তাহার বন,
লতাপাতা ফুল ছায়া বিছাইয়া হরণ করিছে মন।
বনের হরিণী থাকে বনে বনে, জানে সে বনের ভাষা,
সে বন ঘিরিয়া মনখানি তার বাহিরে যায়নি আশা।

সোজনের সাথে তার ভারি ভাব, পথে যদি দেখা হয়,
যেন রাঙা ঘুড়ি আকাশে উড়াল, হেন তার মনে লয়।

একুশ

আজিকার কালে এই কথা শুধু বলে যাই তব কাছে,
যে দুলীরে তুমি জানিয়াছ আজ, তাহা ছাড়া আরো আছে,

এক দুলী যার জীবনের প্রতি নিঃশ্বাসটুকু হায়,
চির বিরহিয়া সোজনেরে তার স্মরিতেছে নিরালায়।'

'কি কথা শুনালে ওহে দুলী তুমি, বল দেখি আরবার,
জীবন যেনরে জুড়াইয়া গেল সাধ হয় বাঁচিবার।'
'আজো দুলী তার সোজনেরে ছাড়া কাহারেও নাহি জানে,
সোজন তাহার ঘরে ও বাহিরে দেহে মনে আর প্রাণে।'

'হায়, হায় দুলী! এই কথা কেন আগে বল নাই মোরে,
তাহলে হয়ত বাঁচিতাম ভবে আরো কিছুদিন তরে।
আমি যে খেয়েছি আপনার হাতে বিষ-লক্ষের বড়ি,
শিয়রে আমার ভিড়িয়াছে আসি – মরণ পারের তরী।'
'কি কথা শুনালে পরাণের সখা! কি কথা শুনালে হায়,
কি দোষ পাইয়া বিষের শায়ক হানিলে পরাণটায়?
তুমি যদি আজ চলিলে বন্ধু, আমারে সঙ্গে নাও,
জনমের মত ছেড়ে চলে যাই এই ধরণীর গাঁও।
সাক্ষী থাকিও চন্দ্র-সূর্য, আর যত দেবগণ!
জনমের মত চলে যাই মোরা লয়ে ব্যথা ক্রন্দন।'

*   *   *

পরদিন ভোরে গাঁয়ের লোকেরা দেখিল বালুর চরে,
একটি যুবক একটি যুবতী আছে গলাগলি ধরে।
অঙ্গে অঙ্গে মিলিয়া অঙ্গ, প্রাণপাখি গেছে উড়ি,
মাটির ধরায় সোনার খাঁচাটি পায়ের আঘাতে ছুঁড়ি।

[illegible]

[illegible] কূলে লাগাওরে নাও,
[illegible] ঘাটে লাগাওরে।
[illegible] নাহি পাইলাম রে কূল,
[illegible] আমার সোবর্ণের ফুল,
– [illegible] লাগাওরে।

– মুর্শিদা গান

[illegible] দিতে তুলে,
[illegible] নদীর কূলে।
[illegible] আলে সিঁদুরের লেখা,
[illegible] রেখা।
[illegible] মৃদুল পায়,
[illegible] গগনের গায়।
[illegible] স্বনে,
[illegible] চিতার কোণে!
[illegible] কূলের গায়,
[illegible] এ বেদনায়।

[illegible] সুরে,
[illegible] পুরে।
[illegible] সনে,
'[illegible] হবে?'
'[illegible]' 'শোন, শোন সেই ব্যথা,
[illegible] কথা।'
[illegible] গান,
[illegible] তান।

'শোন, শোন সেই অপূর্ব কথা, শিমুলতলীর গাঁয়,
সোজন-দুলীর খেলা-ঘরখানি বনের তরুর ছায়।

স্বজন ছাড়িয়া, বান্ধব ছাড়িয়া দুইটি তরুণ হিয়া
গভীর-নিশীথে বাহির হইল এ উহাকে আগুলিয়া।
তারপর সেই ছোট ঘরখানি গোড়ই নদীর তীরে,
মনের কথারে দোলা দিত তারা ছায়ায় ঘিরে!
সেই ঘর হায়, ভাঙিয়া পড়িল ঝরিয়া রাতের বায়;
দুলালীর সেই বিবাহ হইল ভিনদেশী এক গাঁয়।
তারপর সেই বেদের কাহিনী, শোন যত বোন ভাই,
জীবনের দীপ নিভেছে তাদের, ভালবাসা নেভে নাই।
এক নদী তীরে গেঁয়ো ঘাটখানি, তাহারি শীতল ছায়,
আজিও তাহারা গলাগলি ধরি কাঁদিতেছে নিরালায়।'

গান শেষ হয়, পল্লীবাসীরা আঁচলে মুছিয়া বারি,
বলে, 'এ কাহিনী কোথায় শুনেছ? কোথা পেলে খোঁজ তারি?'
'লোকের মুখেতে শুনেছি ঘটনা, আর কিছু নাহি জানি,
নদীতে নদীতে ফিরিতেছি একা সেই ঘাট সন্ধানি।
শুনেছি সে ঘাটে গভীর নিশীথে বিছায়ে তাপিত বুক,
যত বিরহীরা আপন বনের জুড়ায় সকল দুখ।
শুনেছি সে ঘাটে কলসী ভরিয়া বধূরা ফিরিতে ঘরে,
এক ফোঁটা আঁখি-জল রেখে যায় সে অভাগাদের তরে।'
'ওগো মাঝি ভাই! কোনদিন যদি সন্ধান পাও তারি,
ফিরিবার পথে সেই ঘাট হতে আনিও তীর্থবারি।'
সরু সে জলের রেখাপথ ধরি মাঝি দূর পথে ধায়,
সন্ধ্যাতারার দীপ নিভে যায় পশ্চিম নীলিমায়।

সোজন বাদিয়ার ঘাট
প্রথম সংস্করণ ১৩৪০, ২৮শে ফাল্গুন ১৯৩৩
ঊনবিংশ প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১১
(অংশবিশেষ)

জসীম উদ্‌দীন : গ্রাম-বাংলার সাংস্কৃতিক চৈতন্য

জসীম উদ্‌দীন : গ্রাম-বাংলার সাংস্কৃতিক চৈতন্য

মাহমুদ শাহ কোরেশী